বঙ্গশক্তি

সংকলন

রেজি: ডিএ ৬২৬৯, সংখ্যা-২৮
বৈশাখ ১৪২৮ | এপ্রিল ২০২২ | রমজান ১৪৪৩
৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা

মহাযুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশ কি পারবে নিরপেক্ষ থাকতে

ইমরান খানকে দাজ্জাল চিনতে হবে কেন

ধর্ম কি দেশীয় সংস্কৃতির প্রতিপক্ষ?

প্রবন্ধ সংকলন

সম্পাদকীয়

সূচিপত্র

- *মহাযুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশ কি পারবে নিরপেক্ষ থাকতে? ২*
- *বিশ্বসঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে মুক্তির উপায় কী? ৬*
- *ইমরান খানকে দাজ্জাল চিনতে হবে কেন? ১০*
- *তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা কেমন হতে পারে! ১৪*
- *ধর্ম কি দেশীয় সংস্কৃতির প্রতিপক্ষ? ১৮*
- *রসুলাল্লাহর (সা.) যুগে নারীদের ঈদ ২২*
- *জনতার প্রশ্ন - আমাদের উত্তর ২৫*
- *তওহীদ কীভাবে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে? . . . ২৮*
- *অভ্যাস মানুষের দাস ৩১*

প্রকাশক ও সম্পাদক:
এস এম সামসুল হুদা
১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মানিকগঞ্জ প্রেস, ৪৪ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উপদেষ্টামণ্ডলী:
মসীহ উর রহমান
উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী
রুফায়দাহ পন্নী

প্রচ্ছদ ও লেআউট কম্পোজিশন:
হেলাল উদ্দিন

বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:
২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
০২-৪৭২১৮১১১, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪

বিজ্ঞাপন বিভাগ:
০১৬৩৪-২০৮০৩৯

ওয়েব:
www.bajroshakti.com
facebook.com/dailybajroshakti

ই-মেইল:
bajroshakti@gmail.com

যা থাকছে এবারের সংকলনে

পবিত্র মাহে রমজান ও ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে এবারের সংকলনটি সাজানো হয়েছে। তবে গতানুগতিক ধর্মীয় ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যেই লেখাগুলো সীমাবদ্ধ থাকেনি, ইসলামের আলোকে আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন সঙ্কট ও তার সমাধানের পথ-নির্দেশনাও উঠে এসেছে বহু রচনায়।

ইসলাম কোনো মৃত চিন্তার নাম নয়। ইসলাম হলো বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধানের নাম। আল্লাহর রসুল আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হবার সময় আরবের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো কী ছিল? রাজনৈতিক হানাহানি, অর্থনৈতিক বঞ্চনা, ক্ষুধা, দারিদ্র, দাসব্যবস্থা, নারী নির্যাতন, নৈতিক স্খলন, সুদ, ব্যাভিচার, মাদক ইত্যাদি বহুবিধ সঙ্কটে জর্জরিত ছিল ওই সমাজ। সেই সমাজটাই আমূল বদলে গেল রসুলাল্লাহর মাত্র ২৩ বছরের সংগ্রামে। ঐক্যহীন জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল, সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত হলো, ক্ষুধা-দারিদ্র-বেকারত্ব নির্মূল হয়ে গেল, বিশৃঙ্খল মানুষগুলো শৃঙ্খলা মেনে চলতে লাগল, নারীদের ব্যাপারে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে গেল, সমাজ থেকে অন্যায় ও পাপকর্ম প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এল, সুদের কারবার বন্ধ হয়ে গেল, মাদকব্যবসার নাম-নিশানাও মুছে গেল, আর দাসব্যবসার জায়গায় মালিক-শ্রমিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিস্থাপিত হল। এক কথায়, আরবের মানুষ তাদের বাস্তব সঙ্কটের বাস্তব সমাধান পেয়ে গেল। একটা আদর্শ কতখানি নির্ভুল, কতখানি যৌক্তিক- তা বোঝার সর্বোত্তম উপায় হলো সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার ফলকে বিবেচনায় নেওয়া। ইসলাম ১৪০০ বছর আগে যে ফল এনে দিয়েছিল, তা ছিল অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়! তার সিকিভাগও পৃথিবীর অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা আজ পর্যন্ত এনে দিতে পারেনি।

মানুষ গত কয়েক শতাব্দব্যাপী একের পর এক জীবনব্যবস্থা বদল করেছে। পুরোনো জীবনব্যবস্থা ছুঁড়ে ফেলেছে, নতুন জীবনব্যবস্থা প্রয়োগ করেছে। আসলে মানুষ কড়াই থেকে লাফ দিয়ে চুলোয় পড়েছে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চালাতে বিশ্ব এখন বহুমুখী সঙ্কটে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক- সমস্ত অঙ্গন দূষিত হয়ে পড়েছে। ১৬ হাজার পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যে কোনো সময় বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে মহাবিপর্যয় নেমে আসবে পৃথিবীতে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে চলছে অস্থিরতা। যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ থামছেই না। একদিকে সম্পদের পাহাড় সাজিয়ে ভোগ-বিলাসিতায় মেতে আছে কিছু মানুষ, আরেকদিকে কোটি কোটি মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। দুমুঠো চালের অভাবে ঘাস খাচ্ছে, মাটি খাচ্ছে। মজলুমের এই ত্রাহি আর্তনাদ দূর করার জন্যই তো এসেছিল ইসলাম।

এখন পুনরায় ইসলামের প্রকৃত আকিদা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝে, একজন নেতার অধীনে ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে, আল্লাহ-রসুলের দেওয়া কর্মসূচি মোতাবেক সংগ্রামে নামতে হবে উম্মতে মোহাম্মদীকে। কাঁধে তুলে নিতে হবে শোষিত বঞ্চিত মানুষকে উদ্ধারের দায়িত্ব। কীভাবে তা সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর ছড়িয়ে রয়েছে এবারের সংকলনের পাতায় পাতায়।

মহাযুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশ কি পারবে নিরপেক্ষ থাকতে?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আজকের বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে চলছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। ব্রিটিশরা ছিল কার্যত আমাদের প্রভু, আমরা ছিলাম গোলাম। ১৯১৪ সালে ও ১৯৩৯ সালে প্রভুরা যখন ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ করল, গোলামরা কিন্তু ঘরে বসে থাকতে পারল না। বলতে পারল না- তোমাদের যুদ্ধ তোমরা করো গিয়ে, আমরা কেন তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করব? বলতে পারল না, কারণ প্রভু যুদ্ধ করবে আর গোলাম ঘরে বসে থাকবে তা হতে পারে না। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রভু ব্রিটেনের সাম্রাজ্য বাঁচাতে, দেশ বাঁচাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে যেতে বাধ্য হলো ভারতবর্ষের তরুণরা! অথচ তাদের যুদ্ধ করার কথা ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে।

এরপর ব্রিটিশরা যখন ভারত ছেড়ে চলে গেল, একথা মনে করার কারণ নেই তারা সুবোধ বালকের মতো সবকিছু ছেড়েছুড়ে চলে গেছে, আর আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি। না, এত সহজে ভারতবর্ষের গোলামদেরকে আজাদ করে দেওয়ার পাত্র ব্রিটিশরা নয়! যাওয়ার সময় ওরা ভালোভাবেই ভারতবাসীর হাত-পা বেঁধে রেখে গেছে। তারা এমন ব্যবস্থা করে গেছে যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। যাতে ভারতবর্ষের মানুষ নিজেদেরকে স্বাধীন ভেবে আত্মতুষ্টি পেতে পারে, আবার ব্রিটিশদের অবাধ্য হতেও না পারে। মোদ্দাকথা, ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার সময় রেখে গেছে তাদের তৈরি আইন-কানুন-বিধি-বিধান। সেই আইন কানুন ও সিস্টেম দিয়েই চলছে আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, বিচারকার্য, সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি! ফলে স্বাধীনতার এতকাল পরেও আমরা বিভিন্নভাবে ব্রিটিশ তথা পশ্চিমাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে আছি। আর এই পরনির্ভরশীলতা আমাদেরকে নব্য-দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করেছে। আমরা মুখে যতই স্বাধীনতার বুলি আউড়াই, ইঙ্গ-মার্কিন ক্ষমতাবলয় পৃথিবীতে যে বিশ্বব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, তার বৃত্তেই ঘুরপাক খেতে হয় আমাদের সরকারকে ও জনগণকে। তৃতীয় বিশ্বের সরকারগুলো বাধ্য হয় এমন বহু নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে যার সঙ্গে সেই দেশের জনগণের স্বার্থের কোনো সংযোগ নেই। তা শুধুই পরাশক্তিধর মোড়ল রাষ্ট্রগুলোর আদেশ মানার প্রয়োজনে।

অনেকে ভাবতে পারেন, কই! ব্রিটিশরা তো এখন আমাদেরকে আদেশ দিচ্ছে না। আর আদেশ দিলেও আমরা তা মানতে বাধ্য নই। তাদেরকে বলি- রেললাইন যেদিকে যায়, ট্রেনকে সেদিকেই ছুটতে হয়। যখন রেললাইন নির্মাণ করা হয়েছে, তখনই আদেশ দেওয়া হয়ে গেছে। এখন শতবছর ধরেও যদি ট্রেন

চলে, রেললাইন ধরেই চলতে হবে। যত বিজ্ঞ চালকই হোন, রেললাইনের বাইরে দিয়ে ট্রেনকে নিতে পারবেন না। ব্রিটিশদের লাইন ধরে এগোতে এগোতে আমাদের রাষ্ট্র নামক রেলগাড়িটা সেদিকেই এগিয়ে যায়- যা ব্রিটিশরা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, এখন শোনা যাচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি! নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা, আন্তর্জাতিক রাজনীতির গবেষকরা বারবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা ব্যক্ত করছেন। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মুখেও গত কয়েকমাসে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শব্দটি শোনা গেছে বহুবার! এখন প্রশ্ন হলো, সত্যিই যদি আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহলে আমাদের বাংলাদেশের করণীয় কী হবে? আমরা কি পারব সেই যুদ্ধের প্রেক্ষিতে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে? পশ্চিমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে আমরা কি বলতে পারব- তোমাদের যুদ্ধে আমরা কেন যোগ দিব? নাকি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেও আমাদের জীবন যাবে পশ্চিমাদের স্বাধীনতার জন্য, যখন কিনা আমরা নিজেরাই পরাধীন!

একটি ছোট্ট উদাহরণ হাজির করতে চাই। ২০১৫ সালে সৌদি আরব ইয়েমেনে আক্রমণ করেছিল। ব্যাপারটা ছিল সৌদি আর ইয়েমেনের ব্যাপার, শিয়া-সুন্নির ব্যাপার। আরও বড় পরিসরে ভাবলে- জাতিসংঘের ব্যাপার। আমাদের কিছু না। আমাদের কাছে সেই যুদ্ধটা ছিল বড়জোর মানবিক সঙ্কট! সৌদির হামলায় যখন ইয়েমেনের শিশুরা অকাতরে প্রাণ হারাচ্ছিল, তখন বাংলাদেশ যদি যুদ্ধের বিরোধিতা বা নিন্দা জানাত তাহলে সেটা হতো ন্যায্য ও মানবিক সিদ্ধান্ত। আশ্চর্যের বিষয় হলো- বাংলাদেশ যুদ্ধের নিন্দা না করে বরং যোগ দিয়েছিল সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটে। এক প্রকার বাধ্য হয়েই যোগ দেওয়া- তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ সৌদি শেখদের পক্ষে যোগ না দিলে বাংলাদেশের বৈদেশিক জনশক্তি খাতে বিপর্যয় নামিয়ে দিত সৌদি আরব। সেই সৌদির মাথার উপর আবার আছে পশ্চিমাদের আশীর্বাদের হাত! তারাও বাংলাদেশকে ধরা খাইয়ে দিত আন্তর্জাতিক বাজারের কোনো এক অলি-গলিতে! এই অবস্থায় কোনো সরকারই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাহলে আমরা কীভাবে ধরে নিতে পারি- ভবিষ্যতে যে কোনো যুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ তার জোটনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বজায় রাখতে পারবে?

এটা স্বীকার করছি প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মাঝেও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ, চীনের সঙ্গে পশ্চিমাদের আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা, ও চীন-ভারত আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব চলাকালে বাংলাদেশ যেভাবে বিবদমান দু'পক্ষের সঙ্গেই ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে, তা প্রশংসার দাবি রাখে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল স্লোগান হলো- "সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়!" এই নিরপেক্ষতার স্লোগান একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য খুবই প্রয়োজন! কিন্তু নিরপেক্ষতা সবসময় বজায় রাখা সম্ভব হয় না। সবসময় তা ইতিবাচক ফলও দেয় না। বিশেষত যখন বিশ্বে চলছে Might is Right এর শাসন, যেখানে শক্তিমানরাই ঠিক করে দিতে চাইছে ন্যায়-অন্যায়, যেখানে বড় দেশ সামরিক শক্তিবলে ছোট দেশকে দখল করে নেওয়াকেই অধিকার বলে মনে করছে, যেখানে আন্তর্জাতিক আইনের রক্ষকরাও কোনো না কোনো পরাশক্তির এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছে, সেখানে নিরপেক্ষ থাকলেই যে একটি দেশ নিরাপদ থাকতে পারবে তার গ্যারান্টি কোথায়? আমরা নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে যেটা করছি সেটা হলো গা-হাত-পা চুলকে দিয়ে বুনো জন্তুর ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা! সাময়িকভাবে জন্তুটি আমাকে আক্রমণ না-ই বা করল, কিন্তু হঠাৎ কখনও রেগে যাবে না তার গ্যারান্টি কী? তখন কীভাবে সামলাবো তার কোনো পরিকল্পনা আমাদের নেই। অথচ আমাদের মনে রাখা উচিত

ছিল তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে নব্য-উপনিবেশবাদ কায়েম করা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের সেই কুখ্যাত দম্ভোক্তি- "হয় আপনি আমাদের পক্ষে, নয়তো বিপক্ষে!" বুনো জন্তু রেগে গেলে কোনো আশ্বাসবাণী বা কোনো অভিব্যক্তিতেই সে সন্তুষ্ট হয় না। আপনি তার শত্রু নাকি শত্রু নন- সেটাও তার কাছে বিবেচ্য নয়। তার যা লাগবে, সে আদায় করবেই।

পাঠক, কথাটা গভীরভাবে খেয়াল করুন- হয় আপনি আমেরিকার পক্ষে নয়তো বিপক্ষে! অর্থাৎ হয়

আপনি আমেরিকার দালালি করবেন, অন্ধ আনুগত্য করবেন, নয়তো শত্রু বলে বিবেচিত হবেন- এই ধরনের দম্ভোক্তি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট করতে পারে, কারণ তার হাতেই রয়েছে বিশ্বব্যবস্থার চাবি!

গত শতকের নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটলে সারা বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কথাই তখন আইন। কারো সাহস ছিল না যুক্তরাষ্ট্রের অবাধ্য হবার। তারপর পেরিয়ে গেছে ৩০ বছর, আর এই দীর্ঘ সময়ে পৃথিবীর ক্ষমতা-কাঠামোতে একটু একটু করে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে অনেকটা নীরবে আরও দুইটি পরাশক্তির উত্থান ঘটেছে, যারা এতদিন পর ইঙ্গ-মার্কিন জোটের একক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানানো শুরু করেছে। তারা হলো রাশিয়া ও চীন। রাশিয়া ও চীন পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যখন জোট গঠনের কথা ভাবছে, পশ্চিমা জোট তখন সর্বাত্মকভাবে চাইছে রাশিয়া-চীনের জোটকে দুর্বল করে দিতে- যা এখন বিশ্বের বহু দেশের সংঘাতে নেপথ্য কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউক্রেন সঙ্কট তারই অংশ।

> ***পশ্চিমাদের অবাধ্য হলে ঠিক কী ঘটবে তা আগাম বলার উপায় নেই, তবে পশ্চিমারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে মজবুত করেছে যে তৈরি পোশাক খাত, সেই পোশাকের প্রধান ক্রেতা কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকা। আবার বাংলাদেশ যেই আরব দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানি করে আয় করছে, ওইসব আরব দেশ পশ্চিমাদের কথায় ওঠে-বসে। এখন পশ্চিমা জোট যদি চায় খুব সহজেই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ইউরোপ আমেরিকায় প্রবেশ করা আটকে দিতে পারে, কিংবা আরব দেশে জনশক্তি রপ্তানিকে কঠিন করে তুলতে পারে।***

ইউক্রেন এখানে শুধু ইউক্রেন নয়, আর রাশিয়াও শুধু রাশিয়া নয়। রাশিয়া ইউক্রেনকে দেখছে পশ্চিমা জোটের প্রতিনিধি হিসেবে, আর পশ্চিমা জোট রাশিয়াকে দেখছে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের ভবিষ্যৎ হুমকি হিসেবে! তাই পশ্চিমা জোট চাইছে রাশিয়াকে তুলনামূলক দুর্বল অবস্থানে থাকতেই থামিয়ে দিতে! রাশিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা আরোপের উদ্দেশ্য না তো ইউক্রেনকে রক্ষা করা, আর না তো মানবতার দাবি পূরণ করা- আসল উদ্দেশ্য যে রাশিয়ার অর্থনীতিকে ধ্বংস করা তা সবাই জানেন ও বোঝেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো- বাংলাদেশের মতো দেশ কেন যুক্তরাষ্ট্রের কথা মেনে অহেতুক রাশিয়াকে শত্রু মনে করবে? রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার থাকতে পারে আন্তর্জাতিক আধিপত্যের দ্বন্দ্ব, বাংলাদেশের তা নেই। বাংলাদেশ বরং রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিকভাবে ভালো সম্পর্ক রাখলেই উপকৃত হবে। একইভাবে ইউক্রেনের সঙ্গেও বাংলাদেশের নেই কোনো শত্রুতা ও সখ্যতা! ইউক্রেন থেকে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য আমদানি করে, রাশিয়া থেকেও করে। এখন যদি বাংলাদেশকে বলা হয় দু'টো দেশের যে কোনো একটিকে বেছে নিতে- তাহলে বাংলাদেশ যেদিকেই পা বাড়াক, ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশই।

একই সমীকরণের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়াতেও। এখানে আবার চীনকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে পশ্চিমারা। চীনকে ঘেরাও করতে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারতকে নিয়ে গঠন করেছে কোয়াড জোট। ভারত সেই জোটের ব্যাপারে আগ্রহী, কারণ দেশটি চীনের আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী! কাজেই ভারতের স্বার্থ এই কোয়াডে আছে, কিন্তু বাংলাদেশের নেই। বাংলাদেশের ভারতকেও দরকার, চীনকেও দরকার। চীনের উপর বাংলাদেশ যতটা নির্ভরশীল, ততটাই নির্ভরশীল ভারতের উপরেও। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নষ্ট হলে তা বাংলাদেশকে যতটা ভোগান্তির মুখে ফেলবে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হলেও তেমনই ভোগান্তির মুখে পড়তে হবে। তাহলে বাংলাদেশের করণীয় কী? বাংলাদেশ স্বভাবতই চাইবে দুই দেশের মধ্যেই নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে দু'দেশের সঙ্গেই সুসম্পর্ক ধরে রাখতে, তাই নয় কি? সেটা আবার পশ্চিমা জোটের পছন্দ নয়। পশ্চিমারা চায় চীনকে পরিত্যাগ করে বাংলাদেশ কোয়াডে যোগ দিক। যোগ না দিলে কী ঘটতে পারে সেটাও মাথায় রাখতে হচ্ছে বাংলাদেশকে।

পশ্চিমাদের অবাধ্য হলে ঠিক কী ঘটবে তা আগাম বলার উপায় নেই, তবে পশ্চিমারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে মজবুত করেছে যে তৈরি পোশাক খাত, সেই পোশাকের প্রধান ক্রেতা কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকা। আবার বাংলাদেশ যেই আরব দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানি করে আয় করছে, ওইসব আরব দেশ পশ্চিমাদের কথায় ওঠে-বসে। এখন পশ্চিমা জোট যদি চায় খুব সহজেই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ইউরোপ আমেরিকায় প্রবেশ করা আটকে দিতে পারে, কিংবা আরব দেশে

জনশক্তি রপ্তানিকে কঠিন করে তুলতে পারে। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে চাপ আসবে তা চীনও সামাল দিতে পারবে না। আবার আপনি যদি উল্টো করে ভাবেন- পশ্চিমা জোটের চাপে পড়ে বাংলাদেশ যদি চীনবিরোধী কোয়াড জোটে ঢোকে, আর চীন বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও অর্থ সহায়তা প্রদান বন্ধ করে দেয় তাহলে সেই ঘাটতি আবার কোয়াড জোট পূরণ করতে পারবে না। তার মানে বাংলাদেশের এই যে এত উন্নয়নের জোয়ার আমরা দেখতে পাই, তা কাঠামোগতভাবে কতটা ঝুঁকির উপর দাঁড়িয়ে আছে ভাবতেই গা শিউরে ওঠে!

কীভাবে ১৬ কোটি জনসংখ্যাকে যথাযথ আদর্শ শিক্ষা দিয়ে ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল, নীতিবান, সৎ, দেশপ্রেমিক ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী মানুষে পরিণত করা যায় এবং কীভাবে এই বিশাল জনসংখ্যাকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সমন্বয়ে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। তবেই অবসান ঘটবে জাতির পরাধীনতা ও পরনির্ভরশীলতার। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে ১৬ কোটির বাংলাদেশ। চিৎকার করে বলতে পারবে- আমরা কারো গোলাম নই, আমরা স্বাধীন, আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা নিজেরাই নিয়ে থাকি।

ইতোমধ্যেই রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের ঘটনায় বাংলাদেশকে যে অবস্থানে দেখতে চাইছে পশ্চিমা জোট, বাংলাদেশ তা করেনি। ফলে পশ্চিমারা বাংলাদেশের উপর খুব একটা সন্তুষ্ট নয় তা বলাই যায়। কিন্তু ভাবুন তো- যদি রাশিয়ার আক্রমণের জবাব দিতে ন্যাটো জোট ইউক্রেনের যুদ্ধে অংশ নিত তখনও কি বাংলাদেশ নিস্পৃহ থাকতে পারত, আর পশ্চিমারা তা মেনে নিত? কখনই না। দু'টোর মধ্যে একটি পক্ষকে অবশ্যই বেছে নিতে হতো, অপরটির দৃষ্টিতে বাংলাদেশ হয়ে যেত শত্রু। একইভাবে অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনকে কেন্দ্র করে যদি কোনো যুদ্ধ-সংঘাতের উদ্ভব হয়, তখনও কি বাংলাদেশ চীন ও ভারত দু'টোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে পারবে? পারবে না। তখন হয়ত বাংলাদেশকেও শুনতে হবে সেই দম্ভোক্তি- "হয় তুমি আমাদের পক্ষে না হয় বিপক্ষে!"

সেজন্যই প্রয়োজন আত্মনির্ভরশীলতা, প্রয়োজন সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করে সবার আগে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো, যাদের আইন কানুন, রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, নিরাপত্তাব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি কিছুই নিজেদের নয়, জনসংখ্যা ছাড়া যাদের নিজের বলতে আর কিছুই নাই, বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি না করলে যাদেরকে উপোস থাকতে হয়, বৈদেশিক ঋণ না পেলে যাদের বার্ষিক বাজেট পাস হয় না, যাদের সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সরবরাহ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর সহায়তা অনিবার্য, যাদের জনগণ ঐক্যবদ্ধ নয়, দেশপ্রেমিক নয়, যাদের শিক্ষিত লোকেরা দুর্নীতি লুটপাটে মেতে থাকে- তারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার স্বাদ কখনই পেতে পারে না। তাদেরকে সবসময়ই থাকতে হয় নতজানু হয়ে, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মন রক্ষা করে। যে কোনো যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে তারা নিজেদের নীতি ও ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে পারে না, বরং নিরাপত্তা রক্ষা, অর্থনীতি রক্ষা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য তাদেরকে বড় কোনো শক্তির ছাতার নিচে আশ্রয় নিয়ে টিকে থাকতে হয়। তারপর যুদ্ধ/মহাযুদ্ধের এক পর্যায়ে সেই বড় দেশগুলো যখন আশ্রিত ছোট দেশগুলোর স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দখলদারিত্ব আরম্ভ করে, তখন আফসোস ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

বাংলাদেশের তেমন পরিণতি হওয়া এড়াতে চাইলে দেশের নীতি-নির্ধারকদের এখনই খুঁজে বের করা উচিত- কীভাবে ১৬ কোটি জনসংখ্যাকে যথাযথ আদর্শ শিক্ষা দিয়ে ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল, নীতিবান, সৎ, দেশপ্রেমিক ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী মানুষে পরিণত করা যায় এবং কীভাবে এই বিশাল জনসংখ্যাকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সমন্বয়ে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। তবেই অবসান ঘটবে জাতির পরাধীনতা ও পরনির্ভরশীলতার। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে ১৬ কোটির বাংলাদেশ। চিৎকার করে বলতে পারবে- আমরা কারো গোলাম নই, আমরা স্বাধীন, আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা নিজেরাই নিয়ে থাকি।

লেখক: সহকারী সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

বিশ্বসঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে মুক্তির উপায় কী?

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

মানবজাতি আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে যে দাজ্জালীয় বিশ্বব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল, তা এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফলে বিশ্বব্যাপী ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে সামরিক সঙ্কট, অর্থনৈতিক সঙ্কট, রাজনৈতিক সঙ্কট, নিরাপত্তা সঙ্কট, খাদ্য সঙ্কট, আবাসন সঙ্কট, স্বাস্থ্য সঙ্কট, সামাজিক সঙ্কট, পারিবারিক কলহ-দ্বন্দ্বসহ ছোট বড় হাজারও সঙ্কট। এই সঙ্কটগুলো হঠাৎ করে তৈরি হয়নি, বা অন্য কোনো গ্রহ থেকে কেউ পৃথিবীতে এসে মানুষকে এসব সঙ্কটে নিমজ্জিত করেনি, বরং মানুষ নিজেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে দাজ্জালের তৈরি হুকুম-বিধান অনুসরণ করার কর্মফলস্বরূপ এসব সঙ্কটে নিমজ্জিত হয়েছে।

শুরুতেই 'দাজ্জাল' সম্পর্কে দুটো কথা বলে নিই। শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) মানবজাতির ভবিষ্যতে কী কী সংকট আসতে পারে এ বিষয়ে বহু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা হাদিসের বইগুলোতে সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে দাজ্জাল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সবচেয়ে উদ্বেগজনক ও চিত্তাকর্ষক। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সারসংক্ষেপ হচ্ছে, আখেরি জামানায় এক মহা শক্তিশালী দানবের আবির্ভাব হবে যার নাম 'দাজ্জাল'। তার এক চোখ অন্ধ থাকবে। সে মানবজাতির প্রভু, রব বলে দাবি করবে। পুরো মানবজাতি তাকে রব বলে মেনে নেবে। যারা তাকে প্রভু বলে অস্বীকার করবে তাদের জীবনে সে ভয়াবহ বিপর্যয় নিয়ে আসবে। সে এতটাই অতিকায় হবে যে তার এক পা থাকবে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে, আরেক পা পশ্চিম প্রান্তে। তার গতি হবে বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায়। সে ভূগর্ভের সমুদয় সম্পদ উপরে তুলে আনবে, সেই সম্পদ তাকেই অনুসরণ করবে। তার বাহনের দুই কানের দূরত্ব হবে সত্তর হাত। তার কপালে 'কাফের' লেখা থাকবে আর কেবল মো'মেনরাই সেই লেখা পড়তে পারবে। এই দাজ্জাল শব্দের অর্থ হচ্ছে, চাকচিক্যময় প্রতারক। বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, গবেষক, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে রেনেসাঁ সৃষ্টিকারী লেখক মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী বলেছেন, বর্তমান পৃথিবীর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী পাশ্চাত্য বস্তুবাদী যান্ত্রিক সভ্যতাই হচ্ছে সেই দাজ্জাল। রসুলাল্লাহ তাঁর সময়ের মানুষের বোধগম্য হওয়ার জন্য রূপকভাবে এই সভ্যতাকে একটি বিরাট শক্তিশালী দানবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু আমাদের ধর্মবেত্তাগণ সেই রূপক বর্ণনাকে আক্ষরিকভাবে ধরে নিয়ে এক বিরাট দৈত্যাকার প্রাণীর অপেক্ষায় বসে আছেন।

যাহোক, দাজ্জালের তৈরি বিশ্বব্যবস্থায় বিগত বছরগুলোতে যে অন্যায়, অবিচার, শোষণ, বৈষম্য ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে, তা ইতিহাসে নজিরবিহীন। আমরা দেখেছি কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্রব্যবসায়ী রাষ্ট্রগুলো মুসলিমপ্রধান বিভিন্ন দেশের উপর একের পর এক অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। ভয়ানক আগ্রাসন চালিয়ে ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান, লিবিয়াসহ বিভিন্ন মুসলিমপ্রধান দেশের লক্ষ লক্ষ বেসামরিক মানুষকে হত্যা করেছে। দেশগুলো হাজার হাজার টন বোমার আঘাতে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। উদ্বাস্তু হয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলিম নারী-পুরুষ খোলা আকাশের নিচে ঠাঁই নিতে বাধ্য হয়েছে। দুই মুঠো ভাতের জন্য দেহব্যবসা পর্যন্ত করতে হয়েছে মুসলিম নারী, এমন কি পুরুষদেরকেও। কিন্তু জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো ব্যর্থ হয়েছে আগ্রাসন বন্ধ করতে। কথিত মানবাধিকারের অবতারগণ অন্যান্য ইস্যুতে কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করলেও মুসলিম অভিবাসীদের আশ্রয় দিতে রাজি হয়নি, বরং বর্ণবাদী আইন পাস করে মুসলিম প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল কোনো কোনো দেশ। এই নগ্ন আগ্রাসন, স্পষ্ট অত্যাচার ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন যে বিশ্বব্যবস্থায় মুখ বুঁজে মেনে নেওয়া

হয়েছে, তা যে আরও নতুন নতুন আগ্রাসনের জন্ম দিবে, কোটি কোটি মানুষকে উদ্বাস্তু করবে, তা বুঝতে কি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হবার দরকার পড়ে? আজকের রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেন আগ্রাসনের শেকড় প্রোথিত আছে অতীতের ঘটনাগুলোতেই।

মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর বিরুদ্ধে পশ্চিমা ইঙ্গ-মার্কিন জোটের আগ্রাসন, কিংবা বর্তমানের ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন- এটাই প্রমাণ করে যে, এই বিশ্বব্যবস্থায় কোনো দেশই নিরাপদ নয়। কথিত বড় দেশগুলো যখন খুশি ছোট দেশগুলোকে দখল করে নিতে পারে, বেসামরিক মানুষের রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিতে পারে, তা আটকানোর কোনো ব্যবস্থা কারো জানা নেই।

এর উপর ভয়াবহ বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক! এই আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে বিশ্বের প্রতিটি সচেতন মানুষকে। ষোলো হাজারের বেশি পারমাণবিক বোমা মজুত করে রেখে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো যখন একে অপরকে দিবানিশি পরমাণু হামলার হুমকি দেয়, তখন সাধারণ মানুষের ঘুম হারাম না হয়ে উপায় নেই। দাজ্জালের (বিশ্বনবী বর্ণিত চাকচিক্যময় প্রতারক বস্তুবাদী এই সভ্যতা) তৈরি এই বিশ্বব্যবস্থার অন্যতম দুর্বলতা হলো- এখানে মানুষকে যতভাবে পারা যায় ভাগ করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে সঞ্চার করা হয়েছে হাজারও ঘৃণা-বিদ্বেষের উপাদান। এখানে ভাষার ভিত্তিতে, গায়ের রঙের ভিত্তিতে, সংস্কৃতির বৈচিত্রের ভিত্তিতে মানুষকে আলাদা পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, সেই পরিচয়ের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা।

এর সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক সঙ্কট, যা বিশ্বকে অস্থির করে তুলেছে। কাগজের মুদ্রা, মুক্ত বাজারনীতি ও সুদের সমন্বয়ে এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্বে চালু রয়েছে, যাকে শোষণের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বললে অত্যুক্তি হবে না। গরীব আরও গরীব হচ্ছে, ধনীর সম্পদ আরও ফুলে ফেঁপে উঠছে। এই মুহূর্তে বিশ্বের অর্ধেক মানুষের মোট সম্পদের সমপরিমাণ সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়েছে শীর্ষ ৮জন ব্যক্তির হাতে। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় ৪০০ কোটি মানুষের কাছে যে পরিমাণ সম্পদ আছে, ততখানি সম্পদ আছে শীর্ষ ধনী মাত্র ৮ জন ব্যক্তির কাছে। এই ধনকুবেরদের সম্পদ বেড়েই চলেছে সেকেন্ডে সেকেন্ডে, আর ওদিকে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ছে প্রতিনিয়ত। একইভাবে গরীব দেশ ক্রমেই সম্পদ হারাতে হারাতে নিঃস্ব হচ্ছে, আর সেই সম্পদ গিয়ে জমা হচ্ছে ধনী দেশের ভাণ্ডারে! এদিকে অর্থনৈতিক সহায়তার নামে গরীব দেশগুলোর জনগণের গলায় ঋণের সোনার শিকল পরিয়ে দিয়ে অনুগত বানিয়ে রাখছে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো। অবাধ্যতার লক্ষণ দেখলেই আটকে দেওয়া হচ্ছে বৈদেশিক রিজার্ভ, বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে অর্থ সহায়তা। মুহূর্তেই ঋণী দেশের অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, কোটি কোটি মানুষ খাদ্যসঙ্কটের মুখে পড়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। উদাহরণস্বরূপ, আফগানিস্তানের ৯৮০ কোটি ডলার রিজার্ভ আটকে দিয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফলে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করা সম্ভব না হওয়ায় আফগানিস্তানে দেখা দিয়েছে চরম খাদ্যসঙ্কট। হতদরিদ্র মানুষ কিডনি বিক্রি করছে দুই মুঠো খাবারের জন্য। অনেকে ঘাস, লতা-পাতা সিদ্ধ করে খেতে বাধ্য হচ্ছে। ইরানের উপর দীর্ঘদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে, যার দরুন ইরানে তেলের বিশাল ভাণ্ডার থাকার পরও দেশটি ঠিকমত তেল রপ্তানি করে সমৃদ্ধ হতে পারছে না। সম্প্রতি রাশিয়ার উপরও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ফলে রাশিয়ার অর্থব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ধরে চরম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে সবেমাত্র মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ, এখনই শুরু হয়েছে বাংলাদেশের উপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি। এর আগে ইরাক, উত্তর কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের উপর অর্থনৈতিক সঙ্কট আরোপ করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে- বিশ্বে কোনো দেশই অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন নয়। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর ইচ্ছার কাছে স্বাধীনতা/সার্বভৌমত্ব সমর্পণ না করলেই দেশের অর্থনীতির উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কৃত্রিম সঙ্কট। ওদের অনুগত হলেই নানা পুরস্কার উপাধি পাওয়া যায়। আর ওদের অবাধ্য হলেই কপালে জোটে স্বৈরশাসক, গণতন্ত্রহীনতা, সন্ত্রাসী, অকার্যকর রাষ্ট্র ইত্যাদি তকমা। এই ঝুঁকিপূর্ণ ভঙ্গুর, পচে যাওয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা দিয়ে যে মানবজাতি বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না তার প্রমাণ ইতোমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বের দেশে দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট দানা বাঁধছে। মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে। দেউলিয়া হয়ে পড়ছে একের পর এক রাষ্ট্র।

এর উপর ভয়াবহ বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক! এই আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে বিশ্বের প্রতিটি সচেতন মানুষকে। ষোলো হাজারের

বেশি পারমাণবিক বোমা মজুত করে রেখে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো যখন একে অপরকে দিবানিশি পরমাণু হামলার হুমকি দেয়, তখন সাধারণ মানুষের ঘুম হারাম না হয়ে উপায় নেই। দাজ্জালের (বিশ্বনবী বর্ণিত চাকচিক্যময় প্রতারক বস্তুবাদী এই সভ্যতা) তৈরি এই বিশ্বব্যবস্থার অন্যতম দুর্বলতা হলো- এখানে মানুষকে যতভাবে পারা যায় ভাগ করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে সঞ্চার করা হয়েছে হাজারও ঘৃণা-বিদ্বেষের উপাদান। এখানে ভাষার ভিত্তিতে, গায়ের রঙের ভিত্তিতে, সংস্কৃতির বৈচিত্রের ভিত্তিতে মানুষকে আলাদা পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, সেই পরিচয়ের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা। তার ভিত্তিতে আবার গড়ে তোলা হয়েছে দুই শতাধিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, যার একটির সঙ্গে আরেকটির বিরোধ স্বভাবতই লেগেই আছে। ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক সীমারেখা মানেই ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ, ভিন্ন ভিন্ন এজেন্ডা, ভিন্ন ভিন্ন নীতি! পৃথিবীর বুকে ইচ্ছামতো কাল্পনিক সীমারেখা টেনে মানুষে মানুষে বিভেদমূলক উগ্র জাতীয়তাবাদের এই চর্চার পরিণতিতেই কিন্তু দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল। তবু শিক্ষা নেয়নি মানবজাতি। এখন তাদের সামনে বাজছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডঙ্কা। এই যুদ্ধ যদি শুরু হয়ে যায়, তার ব্যাপকতা আমাদের কল্পনার পরিধিকেও ছাড়িয়ে যাবে। আমাদের মতো দেশগুলো, যারা সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, তারাও রেহাই পাবে না পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব থেকে।

> ***৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই ছোট্ট দেশটিতে যেন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সঙ্কটের কালবৈশাখী ঝড় বয়ে যাচ্ছে। রাজনীতির নামে দীর্ঘদিন থেকে চলছে হানাহানি, খুনোখুনি, দলাদলি, সন্ত্রাস; ধর্মের নামে চলছে ব্যবসা, উগ্রবাদ, হুজুগ, গুজব, সাম্প্রদায়িকতা; শিক্ষার নামে চলছে বাণিজ্য, চিকিৎসার নামে চলছে ডাকাতি, সংস্কৃতিচর্চার নামে চলছে অশ্লীলতা, দেশসেবার নামে চলছে ঘুষ, দুর্নীতি, লুটপাট, অর্থপাচার; ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে চলছে সিন্ডিকেট, প্রতারণা, ঋণ খেলাপি, খাদ্যে ভেজাল, অবৈধভাবে খাদ্য মজুদ, বিদেশে সম্পদ পাচার ইত্যাদি। এদিকে প্রযুক্তির অপব্যবহার, নারী নির্যাতন, ডিজিটাল ডিভাইস আসক্তি, পর্ণগ্রাফি, গুম, খুন, মাদক, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। রয়েছে খালখোর, ভূমিখোর, বনখোর, বিলখোর, নদীখোরদের দৌরাত্ম্য! সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যদি এরকম মারণব্যাধি বাসা বাঁধে, তাহলে একটা জাতি কীভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে? বৈদেশিক সঙ্কটের প্রভাব বাদ দিলেও, নিজেরাই তো নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট!***

কিছুক্ষণের জন্য এসব আন্তর্জাতিক সঙ্কট ভুলে গিয়ে আপনি যদি দেশের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের দিকে তাকান, সেখানেও বিচলিত না হয়ে পারা যায় না। ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই ছোট্ট দেশটিতে যেন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সঙ্কটের কালবৈশাখী ঝড় বয়ে যাচ্ছে। রাজনীতির নামে দীর্ঘদিন থেকে চলছে হানাহানি, খুনোখুনি, দলাদলি, সন্ত্রাস; ধর্মের নামে চলছে ব্যবসা, উগ্রবাদ, হুজুগ, গুজব, সাম্প্রদায়িকতা; শিক্ষার নামে চলছে বাণিজ্য, চিকিৎসার নামে চলছে ডাকাতি, সংস্কৃতিচর্চার নামে চলছে অশ্লীলতা, দেশসেবার নামে চলছে ঘুষ, দুর্নীতি, লুটপাট, অর্থপাচার; ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে চলছে সিন্ডিকেট, প্রতারণা, ঋণ খেলাপি, খাদ্যে ভেজাল, অবৈধভাবে খাদ্য মজুদ, বিদেশে সম্পদ পাচার ইত্যাদি। এদিকে প্রযুক্তির অপব্যবহার, নারী নির্যাতন, ডিজিটাল ডিভাইস আসক্তি, পর্ণগ্রাফি, গুম, খুন, মাদক, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। রয়েছে খালখোর, ভূমিখোর, বনখোর, বিলখোর, নদীখোরদের দৌরাত্ম্য! সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যদি এরকম মারণব্যাধি বাসা বাঁধে, তাহলে একটা জাতি কীভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে? বৈদেশিক সঙ্কটের প্রভাব বাদ দিলেও, নিজেরাই তো নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট!

এই হলো পশ্চিমা বস্তুবাদী দাজ্জালীয় সভ্যতাকে অনুসরণের ফল, আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে দাজ্জালকে হুকুমদাতা বলে মেনে নেওয়ার ফল। আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা, তাই তিনি জানেন মানুষ কোন হুকুমে, কোন ব্যবস্থায় জীবনযাপন করলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারবে, ভাই ভাই হয়ে বসবাস করতে পারবে। সেই বিধি-ব্যবস্থা তিনি যুগে যুগে নবী-রসুলদের মাধ্যমে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। কালক্রমে মানুষ সেই ব্যবস্থাকে বিকৃত করে ফেলেছে, তবু আল্লাহর নামেই চালিয়েছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে নিজেদের জীবনযাপন প্রণালী মানুষ কখনই নিজে তৈরি করার চেষ্টা করেনি। এই চেষ্টা প্রথমবারের মতো হয় ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে, রাজা অষ্টম হেনরির রাজত্বের সময়। রাষ্ট্র ও ধর্মের সংঘাত এড়াতে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয়- এখন থেকে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের কোনো সংযোগ থাকবে না এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা,

আইন-কানুন ইত্যাদির জন্য স্রষ্টার দিকে তাকিয়ে থাকার দরকার নেই, এগুলো মানুষ নিজেরাই তৈরি করে নিবে। ওই সিদ্ধান্ত থেকেই পরবর্তীতে ধর্মহীন বস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতার জন্ম হয়, যা কালক্রমে পুরো পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এদিকে ঐ পাশ্চাত্য 'সভ্যতা' অস্ত্রপ্রযুক্তি, অর্থ, মিডিয়া, সামরিক শক্তি ইত্যাদির বলে প্রায় গোটা বিশ্বকে কব্জা করে নেয়। সেই সভ্যতার গর্ভেই জন্ম নেয় আজকের চাকচিক্যময় প্রতারক বিশ্বব্যবস্থা, যা মানুষকে মুক্তির গল্প শুনিয়ে এখন ধ্বংসের শেষ প্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। তারা অপরকে মানবতাবাদের গল্প শোনায়, কিন্তু তারাই সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লংঘন করে। তাদের মারণাস্ত্রের আঘাতে আজ পৃথিবীর মাটি রক্তে পিচ্ছিল।

এক আল্লাহর সৃষ্টি, এক পিতা মাতার সন্তান এই মানবজাতি যেখানে ভাই ভাই হয়ে বসবাস করার কথা, তাদেরকে দাজ্জালই ভাষার ভিত্তিতে, বর্ণের ভিত্তিতে, ভূখণ্ডের ভিত্তিতে, সংস্কৃতির ভিত্তিতে আলাদা করে ফেলেছে এবং একে অপরের ঘোর শত্রু বানিয়ে ছেড়েছে। ফলে মানুষের ধ্বংসের চূড়ান্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছে মানুষই।

এখন এই অনিবার্য পরিণতি এড়ানোর উপায় একটাই- যদি মানবজাতি দাজ্জালের অন্ধ অনুসরণ বাদ দিয়ে আবারও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়, আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা বলে মেনে নেয় এবং দাজ্জালের দেওয়া ব্যবস্থাগুলো প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর হুকুমের উপর ভিত্তি করা একটি ভারসাম্যপূর্ণ, প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, ন্যায়ভিত্তিক জীবনব্যবস্থার মধ্যে থেকে জীবনযাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবেই তারা অনিবার্য ধ্বংস থেকে রেহাই পেতে পারে। এই প্রস্তাব আমরা দিয়েই যাব, এই আহ্বান করেই যাব। জানি না কার কালঘুম ভাঙবে, কে ফিরে আসবে, কে প্রত্যাখ্যান করবে। সে দায় যার যার। মাটি ও মানুষের কল্যাণে, সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে, মানবতাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ সকলের দায়িত্ব বলে আমরা মনে করি।

সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান নির্বিশেষে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের সকল শান্তিকামী মানুষ যেন সুখে থাকে, শান্তিতে থাকে। অতীতের সকল জরা, সকল গ্লানি, সকল জীর্ণতা ঘুচে যাক। পরাশক্তিধর অস্ত্র ব্যবসায়ী সাম্রাজ্যবাদী দানবদের কালো থাবা থেকে মহান আল্লাহ পাক যেন আমাদের হেফাজত করেন এই প্রার্থনা করি।

লেখক: এমাম, হেযবুত তওহীদ

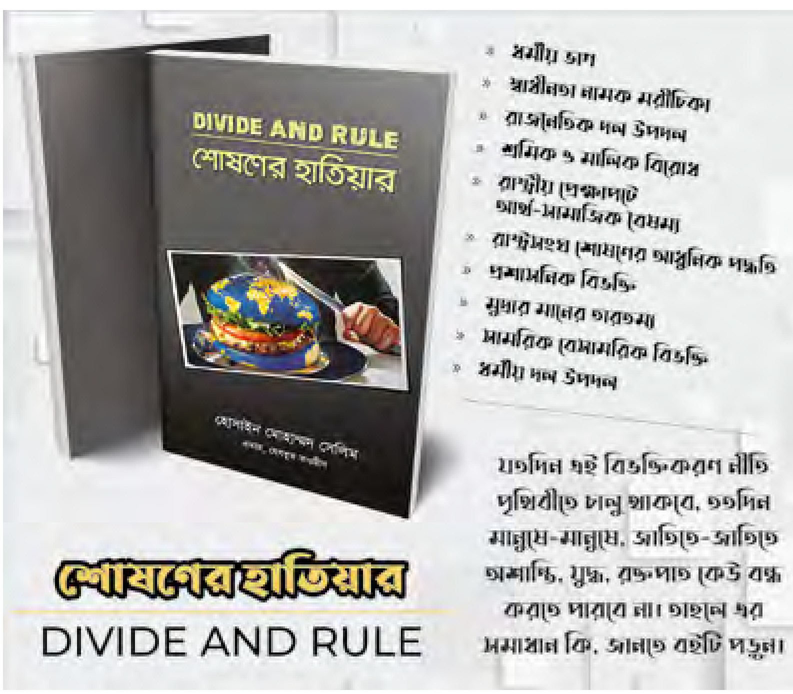

ইমরান খানকে দাজ্জাল চিনতে হবে কেন?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

ইঙ্গ-মার্কিন বলয় থেকে বেরিয়ে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান রাশিয়া চীন বলয়ে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা।

১.
লেখার শুরুতেই পাঠককে দাজ্জাল সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেওয়ার দরকার মনে করছি। আমরা মুসলমানমাত্রই দাজ্জালের নাম শুনেছি। আখেরি জামানা সম্পর্কে আমাদের নবীজীর যত ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তার মধ্যে দাজ্জাল সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী অন্যতম। হাদিসে দাজ্জাল সম্পর্কে বহু বর্ণনা রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো- দাজ্জাল নিজেকে পৃথিবীর রব বা প্রভু বলে দাবি করবে। তার এক হাতে থাকবে জান্নাত, আরেক হাতে থাকবে জাহান্নাম। যারা তাকে রব বলে মেনে নিবে তাদেরকে সে জান্নাতে প্রবেশ করাবে, রেজেক দিবে, আর যারা তাকে প্রভু বলে মানবে না তাদেরকে জাহান্নামে দিবে ও প্রচণ্ড কষ্ট দিবে। অল্প কিছু মো'মেন ছাড়া দাজ্জালকে সবাই প্রভু বলে মেনে নিবে ও তার পায়ে সেজদা করবে। দাজ্জাল পৃথিবীর সমুদ্রভাগ ও স্থলভাগ আচ্ছন্ন করবে। বায়ুতাড়িত মেঘের মতো সে ছুটে চলবে। জুমার সালাহ করতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণের মধ্যে সে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবে। দাজ্জালের বাহনের দুই কানের দূরত্ব হবে সত্তর হাত। তার এক পা থাকবে পৃথিবীর মাগরিবে, আরেক পা থাকবে মাশরেকে। দাজ্জালের আদেশে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, সমুদ্রের তলদেশ থেকে সম্পদ উঠে আসবে। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটবে দাজ্জালের সময়, যা থেকে পানাহ চেয়েছেন নুহ (আ.) থেকে শুরু করে আখেরি নবী পর্যন্ত সকল নবী-রসুল!

দাজ্জাল সম্পর্কিত এই হাদিসগুলো গত ১৪০০ বছর ধরেই আমাদের সমাজে মুখে মুখে শোনা গেছে। দাজ্জাল নিয়ে লেখালেখি, ওয়াজও কম হয়নি। কিন্তু আমাদের আলেম ওলামাগণ সর্বদাই দাজ্জালকে আক্ষরিক অর্থেই একটি দানব হিসেবে কল্পনা করে এসেছেন! তারা কখনই বিষয়টি তলিয়ে দেখেননি, তাই দাজ্জাল সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর গভীরতা ও মর্মবাণী তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। এমনই এক পর্যায়ে, আজ থেকে ৫০০ বছর আগে আমাদের আলেম ওলামাগণ যখন দাজ্জাল নামক দৈত্যাকার এক দানবের ওয়াজ করতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন অন্য প্রান্তে ইউরোপে "ধর্মনিরপেক্ষতা" নামের একটি মতবাদের জন্ম হয়। যে সময়ের কথা বলছি তখন ইংল্যাণ্ডে চলছিল রাজা অষ্টম হেনরির রাজত্বকাল। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ডের মানুষ প্রথমবারের মতো

সিদ্ধান্ত নিল- তাদের জাতীয় জীবনের আইন, কানুন, দণ্ডবিধি, সিস্টেম ইত্যাদি তারা নিজেরাই বানিয়ে নিবে, এবং তাতে ধর্মের কোনো প্রবেশাধিকার থাকবে না। বলা বাহুল্য, ওই সময়ের আগে মানুষের জাতীয় জীবনে ধর্মই ছিল সকল আইন-কানুনের উৎস। ধর্মকে বাদ দিয়ে জাতীয় জীবন পরিচালনার কথা কেউ ভাবতেও পারত না।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পশ্চিমা জোট পাকিস্তানকে রুশ আগ্রাসনের নিন্দা জানানোর জন্য বারবার চাপ দিতে থাকে। কিন্তু ইমরান খান সেই প্রস্তাব শুধু প্রত্যাখান করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি এক সমাবেশে পশ্চিমা দেশগুলোর উদ্দেশে বলেন- "আমরা কি তোমাদের গোলাম যে তোমরা যা বলবে তা-ই করতে হবে?" অতি সাংঘাতিক প্রশ্ন!

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে যখন ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম দেওয়া হলো, তখনও কেউ ঘুনাক্ষরেও ভাবেনি তারা কেবল একটি মতবাদেরই জন্ম দিল না, তারা জন্ম দিল পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর এক দানবীয় সভ্যতার, যাকে আল্লাহর রসুল রূপকভাবে দাজ্জাল বলে অভিহিত করেছিলেন। সেদিনের সেই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের উপরেই পরবর্তীতে গড়ে ওঠে পশ্চিমা বস্তুবাদী যান্ত্রিক সভ্যতা, যা গত ৫০০ বছরে পৃথিবীর উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্বে থেকে পশ্চিমে- সবখানে দখল প্রতিষ্ঠা করেছে। না, সেই দখল শুধু ভূখণ্ডের উপরে নয়, মানুষের জীবনের অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচার, যুদ্ধ, শিক্ষা, বাণিজ্য, মতাদর্শ, প্রচারমাধ্যম, সংস্কৃতি এক কথায় সর্ববিষয়ে পশ্চিমা বস্তুবাদী যান্ত্রিক সভ্যতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সবাই তার সামনে সেজদাবনত হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। দাজ্জাল তথা পশ্চিমা যান্ত্রিক সভ্যতা নিজের পছন্দমত এমন এক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যে ব্যবস্থায় দাজ্জালের হুকুমই আইন বলে বিবেচিত হয়। মানবজাতি ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক দাজ্জালের গোলামী করতে বাধ্য থাকে। কেউ দাজ্জালের গোলামী করতে অস্বীকৃতি জানালে, তার পরিণতি হয় ভয়াবহ।

দুঃখের বিষয় হলো- এই যে দাজ্জাল জন্ম নিয়ে শৈশব কৈশোর পার হয়ে যৌবনে উপনীত হলো, সারা বিশ্বকে করায়ত্ব করল, পৃথিবীকে তার তৈরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করল এবং তার ফলে পুরো মানবজাতিকে কার্যত দাস বানিয়ে রাখার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে ফেলল, এতকিছু হয়ে গেলেও আমাদের ধর্মীয় নেতারা কিছুই টের পেলেন না। তারা এখনও বসে আছেন বিরাট ঘোড়ায় উপবিষ্ট একচোখ বিশিষ্ট দৈত্যাকার এক দানবের অপেক্ষায়! তারা যদি একটু যুক্তিবোধ খাটিয়ে রসুলাল্লাহর হাদিসগুলোর সঙ্গে বর্তমানের বস্তুবাদী যান্ত্রিক সভ্যতাকে মিলিয়ে দেখতেন, তাহলে হয়ত দাজ্জালকে চিনতে পারতেন, মুসলিম জনসাধারণকেও চেনাতে পারতেন।

২.

পাকিস্তানের সদ্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান একজন মুসলমান হিসেবে নিজেও দাজ্জাল সম্পর্কে নিশ্চয়ই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছেন। কিন্তু যথারীতি তিনিও দাজ্জালকে চিনতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তার সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড ও তার ফলে সৃষ্ট বেহাল দশা-ই প্রমাণ করে, তিনি দাজ্জালের ফাঁদে ফেঁসে গেছেন সহজেই।

পাকিস্তান দেশটি দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্রদেশ হিসেবে পরিচিত হয়ে এসেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালেও যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে একচ্ছত্র সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে এসেছে। কিন্তু যে কারণেই হোক সম্প্রতি ইমরান খান যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েন! তিনি যুক্তরাষ্ট্র বলয় থেকে বেরিয়ে পাকিস্তানকে রাশিয়া-চীন বলয়ে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন বলে বিশ্লেষকদের ধারণা। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা দেশগুলো যখন রাশিয়ার সমালোচনায় মুখর, পাকিস্তানের এই সদ্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তখন রাশিয়া সফর করে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যা পশ্চিমারা সুনজরে দেখেনি। মূলত এই সফরের সময়ই ইমরান খান পশ্চিমাদের টার্গেটে পড়েছেন বলে বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পশ্চিমা জোট পাকিস্তানকে রুশ আগ্রাসনের নিন্দা জানানোর জন্য বারবার চাপ দিতে থাকে। কিন্তু ইমরান খান সেই প্রস্তাব শুধু প্রত্যাখান করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি এক সমাবেশে পশ্চিমা দেশগুলোর উদ্দেশে বলেন- "আমরা কি তোমাদের গোলাম যে তোমরা যা বলবে তা-ই করতে হবে?" অতি সাংঘাতিক প্রশ্ন! এই প্রশ্নটাই দাজ্জাল অপছন্দ করে সবচেয়ে বেশি। ইমরান খান বুঝে হোক, না বুঝে হোক এমন এক প্রশ্ন করে ফেলেছেন, যা সরাসরি দাজ্জালের প্রভুত্বের দিকে আঙ্গুল তুলেছে!

এই প্রশ্ন তোলার পরেই ইমরান খানের গদি নিয়ে টানাটানি শুরু হয়। সংসদে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব

উত্থাপন করা হয়। বিরোধী দলগুলো শুরু করে সরকার পতন আন্দোলন। এদিকে ইমরান খানের সঙ্গী-সাথী, রাজনৈতিক সহযোগীরাও পক্ষত্যাগ করতে আরম্ভ করে। প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান হয়ে পড়েন কোনঠাসা। প্রধানমন্ত্রীত্ব বাঁচাতে মরিয়া হয়ে লড়াই করেছেন প্রায় একটি মাস। কিন্তু সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে অনাস্থা ভোটে পরাজিত হন ইমরান খান।

> ***ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী হবার পর ধরেই নিয়েছিলেন জাতির চূড়ান্ত ক্ষমতার চাবি তার হাতে। সেই ধারণা ভুল ছিল। চূড়ান্ত ক্ষমতা দাজ্জাল কাউকে দেয় না। এই বিশ্বব্যবস্থায় একমাত্র দাজ্জালই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। দাজ্জালের তৈরি এই বিশ্বব্যবস্থা এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যা প্রত্যেক জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তুলে দিয়েছে দাজ্জালের হাতে।***

অতীতের অতীতের প্রধানমন্ত্রীদের মতো ইমরান খানও তার মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হলেন। কেন তাকে প্রধানমন্ত্রীত্ব হারাতে হলো- তার ব্যাখ্যা হিসেবে পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রকেই সামনে আনছেন ইমরান খান। তিনি একটি চিঠি প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন যেটাতে একটি "শক্তিশালী" দেশের পক্ষ থেকে পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে লেখা হয়েছে, 'ইমরানকে অপসারণ করা হলে পাকিস্তানের সব দোষ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।' তার মানে দাঁড়ায়- পাকিস্তানের ক্ষমতার পালাবদলটা দেশের ভেতর থেকে ঘটছে না, এসবের কলকাঠি নাড়া হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে!

ইমরান খানের অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না, কারণ ইতোমধ্যেই পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে দেখা গেছে রাশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসনের বিরোধিতা করে বক্তব্য দিতে- যা ইমরান খানের পররাষ্ট্রনীতির সরাসরি বিপরীত! ইমরান খান পশ্চিমাদের দিকে চোখ রাঙাচ্ছেন, আর সেনাপ্রধান কথা বলছেন পশ্চিমা সুরে সুর মিলিয়ে!

তবে কি পশ্চিমাদের গোলামী করতে না চাওয়াই কাল হলো ইমরানের জন্য?

মনে রাখতে হবে, প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এমন একজন ব্যক্তি, যিনি ক্রিকেটাঙ্গনের মতোই পাকিস্তানের রাজনীতিতেও চমক দেখিয়েছিলেন। বহু অভিজ্ঞ ও ঝুনা রাজনীতিককে পরাস্ত করে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার নিজের দখলে নিয়েছিলেন। কিন্তু আফসোস ইমরান সাহেবের জন্য, তিনি দাজ্জালকে চিনতে পারেননি। বর্তমানের এই বিশ্বব্যবস্থা যে দাজ্জালের তৈরি বিশ্বব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্যের ইহুদি খ্রিস্টান বস্তুবাদী সভ্যতাই যে আখেরি নবী বর্ণিত দানব দাজ্জাল- তা ইমরান খান এখনও বুঝতে পারেননি। যার ফলে এই বিশ্বব্যবস্থার বড় একটি সমীকরণ এখনও তার বোঝাপড়ার বাইরেই রয়ে গেছে।

রসুল (সা.) বলেছিলেন, দাজ্জাল নিজেকে প্রভু বলে দাবি করবে। তাকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রভু বলে মানতে দিবে না। পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতারও দাবি সেটাই। এই সভ্যতা জানতে চায় না আপনি ব্যক্তিগতভাবে নামাজী নাকি বেনামাজী, রোজাদার নাকি বেরোজদার, আস্তিক নাকি নাস্তিক, মসজিদে যান নাকি মন্দিরে যান- এই সভ্যতা আপনার ব্যক্তিগত জীবনের ইবাদত বন্দেগী নিয়ে চিন্তিত নয়। সে জানতে চায় শুধু একটা প্রশ্নের জবাব- আপনি দাজ্জালের সার্বভৌমত্ব মানেন কিনা!

ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী হবার পর ধরেই নিয়েছিলেন জাতির চূড়ান্ত ক্ষমতার চাবি তার হাতে। সেই ধারণা ভুল ছিল। চূড়ান্ত ক্ষমতা দাজ্জাল কাউকে দেয় না। এই বিশ্বব্যবস্থায় একমাত্র দাজ্জালই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। দাজ্জালের তৈরি এই বিশ্বব্যবস্থা এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যা প্রত্যেক জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তুলে দিয়েছে দাজ্জালের হাতে। এই বিশ্বব্যবস্থায় দাজ্জালকে প্রভু বলে মেনে নেওয়ার পর একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাওয়াও কঠিন কিছু না, পক্ষান্তরে দাজ্জালের বিরোধিতা করলে একটা ওয়ার্ডের মেম্বার হওয়াও দুষ্কর! দাজ্জালকে মেনে নিলে আসে রিজিকের ভাণ্ডার, আসে অর্থ সহায়তা, আসে সমর্থনও। পক্ষান্তরে দাজ্জালের বিরোধিতা করলে অপূর্ণ থাকে ন্যায্য অধিকার!

ইমরান খানের আগে যত প্রধানমন্ত্রী এসেছেন-গেছেন, দাজ্জালকে প্রভু বলে মেনে নিয়েই ক্ষমতার স্বাদ নিয়েছেন। ইমরান কি তা জানতেন না? তিনি কি জানতেন না এই বিশ্বব্যবস্থায় ক্ষমতার উৎস জনগণও নয়, সামরিক বাহিনীও নয়, ক্ষমতার উৎস দাজ্জাল? এতদিন তিনি যে ক্ষমতাটুকু ভোগ করেছেন তা দাজ্জাল করুণা করে ভোগ করতে দিয়েছে বলেই ভোগ করতে পেরেছেন। আর এখন দাজ্জাল তার উপর বিরক্ত, তাই বেজেছে বিদায়ঘণ্টা!

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে ইমরান খান সমালোচিত হন, কিন্তু ওসব তার আসল অপরাধ নয়। ইমরান খানের আসল

অপরাধ হলো দাজ্জালীয় বিশ্বব্যবস্থায় বাস করে, দাজ্জালের দেওয়া অর্থনীতি, রাজনীতি, সামরিক নীতি মেনে নিয়ে, তিনি কিনা দাজ্জালের দিকেই আঙ্গুল তুলেছেন! গোলাম হয়ে প্রভুর দিকে চোখ রাঙিয়েছেন! তারই দণ্ড দিচ্ছে দাজ্জাল!

ইমরান খান হঠাৎ আরেকটা জিনিস আবিষ্কার করেছেন যে, তার আশেপাশের লোকগুলো, রাজনৈতিক জোটের শরিকরা, মন্ত্রীসভার মন্ত্রীরা, এমনকি তার নিজ দলের নেতারা পর্যন্ত তাকে পরিত্যাগ করা আরম্ভ করেছে, যেটাকে তিনি "বিশ্বাসঘাতকতা" বলে অভিহিত করেছেন! সত্যি বলতে দাজ্জালের প্রভাব-প্রতিপত্তির একটি অংশ তিনি আবিষ্কার করেছেন মাত্র! এভাবেই প্রত্যেক জাতিরাষ্ট্রে দাজ্জাল তার পছন্দের সিস্টেম চাপিয়ে দেওয়ার পর সেই সিস্টেম রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য তার মগজ ধোলাই করা অনুসারীও বসিয়ে রেখেছে, যারা কখনই দাজ্জালের দাসত্ব থেকে জাতিকে বের হতে দিবে না। তারা নিজ জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, কিন্তু দাজ্জালের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

৩.

পাকিস্তানের ইমরান খানের পরিস্থিতি দেখে শিক্ষা নেওয়া উচিত সারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইমরান খানদের! সবার বোঝা উচিত এমন এক বিশ্বব্যবস্থায় তাদের বাস- যে ব্যবস্থায় ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র, রাজনীতি থেকে অর্থনীতি, সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় দাজ্জালের সুতোর টানে! এই বিশ্বব্যবস্থায় প্রত্যেক জাতির হাতে পায়ে দড়ি বাঁধা! দাজ্জালের বেঁধে দেওয়া ছকেই চলতে হয় প্রত্যেক জাতিকে। আর স্বাধীনতা? সে তো মরিচিকা! দাজ্জাল তার গোলামীকেই স্বাধীনতা আখ্যা দিয়েছে ও সারা বিশ্বের মানুষকে তা বিশ্বাস করিয়েছে। এখানে একজন ব্যক্তির করার কিছুই নেই, যদিও তিনি প্রধানমন্ত্রী হোন, বা রাষ্ট্রপতি হোন।

কোনো বস্তু অভিকর্ষ বল অতিক্রম করে মহাশূন্যে যাবার জন্য যেমন প্রচণ্ড বেগের প্রয়োজন হয়, তেমনি দাজ্জালের তৈরি শৃঙ্খল ভেঙে একটি জাতিকে বেরোতে চাইলেও প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন পড়বে। এই শক্তি ছিল না ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের, মিশরের মুহাম্মদ মুরসীর, লিবিয়ার গাদ্দাফীর, কিংবা সিরিয়ার বাসার আল আসাদের। তাই দেশগুলো এখন ধ্বংসস্তুপ! কাজেই দাজ্জালের অবাধ্য হবার আগে একজন নেতার ভেবে দেখা উচিত তার পায়ের নিচে মাটি আছে কিনা, তার জাতি দাজ্জালের আগ্রাসন মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত কিনা।

যারা সত্যিই দাজ্জালকে মোকাবেলা করতে চায়, দাজ্জালের গোলামী থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে চায়, তারা শুধু মুখের চটকদার কথা দিয়ে পারবেন না, তাদেরকে অবশ্যই কয়েকটি শর্ত পূরণ করতেই হবে। যথা-

১. জনগণকে দাজ্জাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।
২. জনগণকে এক নেতার অধীনে ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।
৩. জনগণের মধ্যে দলাদলি, বিভাজন রাখা যাবে না। দলাদলি ও বিভাজন সৃষ্টি হয় এমন ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।
৪. দাজ্জালের তৈরি রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, সামরিক ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করা যাবে না। দাজ্জালের দেওয়া অন্যায় ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে নিখুঁত/নির্ভুল ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৫. পুরো জাতিকে নিরাপত্তা পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। জনগণের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার চেতনা সঞ্চার করতে হবে।
৬. জনগণকে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। কৃষি, খাদ্য, শিল্প, প্রযুক্তি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হবে যাতে দাজ্জালের উপর নির্ভর করতে না হয়।

কেবল এভাবেই একটি জাতি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে এবং একমাত্র সেই জাতির নেতার মুখেই শোভা পাবে স্বাধীনতার কথা! ওই জাতির অবিসংবাদিত নেতা যখন বলবেন- আমরা কারো গোলাম নই, আমাদেরকে যা বলা হবে তাই করতে বাধ্য নই, তখন সেই কথার ওজন থাকবে, মূল্য থাকবে। অন্যথায় জাতিকে প্রস্তুত না করলে মুখরোচক কথাগুলোই বুমেরাং হয়ে দাঁড়াবে দেশের জন্য, জনগণের জন্য!

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা কেমন হতে পারে!

জিনাত ফেরদাউস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এক সাক্ষাৎকারে আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কোন অস্ত্র দিয়ে হবে তা জানি না, তবে চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ হলে তা হবে লাঠি আর পাথর দিয়ে।" তার মানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানুষ যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করবে, ভয়ংকর মারণাস্ত্র ব্যবহার করবে তাতে পুরো মানবসভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এমনভাবে ধ্বংস হবে যা মানুষকে লাঠি-পাথরের যুগে ফেরত নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরমাণু অস্ত্রের কার্যকারিতা দেখার পর দেশে দেশে পরমাণু অস্ত্র তৈরির তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল, যা এখনও চলমান আছে। বিবিসির সূত্রমতে বর্তমানে শুধু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কাছেই প্রায় তেরো হাজার পরমাণু বোমা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আছে ৬৮০০টি ও রাশিয়ার আছে ৭০০০টি পরমাণু বোমা। অন্যান্য পরমাণু অস্ত্রধারী দেশগুলো হলো- ফ্রান্স (৩০০টি), চীন (২৭০টি), ব্রিটেন (২১৫টি), পাকিস্তান (১৪০টি), ভারত (১৩০টি), ইসরাইল (৮০টি), উত্তর কোরিয়া (২০টি)। একদিকে সভ্যতা-বিনাশী পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা চলছে, আরেকদিকে চিন্তাশীল মানুষকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে একটি ভয়ংকর প্রশ্ন- "কী হবে যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যায় এবং সেই যুদ্ধে পরমাণু অস্ত্রধারী দেশগুলো তাদের কাছে থাকা পরমাণু বোমাগুলো ব্যবহার করা শুরু করে?"

৭৬ বছর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। সেই যুদ্ধে কোটি কোটি মানুষ হয়েছে হতাহত। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল, যা মানবজাতির ইতিহাসে আর কখনই ঘটেনি। তা হলো- মাত্র দুইটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে জাপানে দুই থেকে আড়াই লাখ মানুষের মৃত্যু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওই পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ এত বড় ঘটনা ছিল যা দেখার জন্য সবচেয়ে নিষ্ঠুর মানুষটিও হয়ত প্রস্তুত ছিলেন না। পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং মানবজাতির হাজার বছরের চিরচেনা যুদ্ধ-বিগ্রহের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে আধুনিক সভ্যতা প্রবেশ করে সম্পূর্ণ নতুন এক পর্বে, নতুন এক চ্যালেঞ্জে, যা তাকে অস্তিত্বের প্রশ্নে এনে দাঁড় করায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরমাণু অস্ত্রের কার্যকারিতা দেখার পর দেশে দেশে পরমাণু অস্ত্র তৈরির তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল, যা এখনও চলমান আছে। বিবিসির সূত্রমতে বর্তমানে শুধু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কাছেই প্রায় তেরো হাজার পরমাণু বোমা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আছে ৬৮০০টি ও রাশিয়ার আছে ৭০০০টি পরমাণু বোমা। অন্যান্য পরমাণু অস্ত্রধারী দেশগুলো হলো- ফ্রান্স (৩০০টি), চীন (২৭০টি), ব্রিটেন (২১৫টি), পাকিস্তান (১৪০টি), ভারত (১৩০টি), ইসরাইল (৮০টি), উত্তর কোরিয়া (২০টি)। একদিকে সভ্যতা-বিনাশী পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা চলছে, আরেকদিকে চিন্তাশীল মানুষকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে একটি ভয়ংকর প্রশ্ন- "কী হবে যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যায় এবং সেই যুদ্ধে পরমাণু অস্ত্রধারী দেশগুলো তাদের কাছে থাকা পরমাণু বোমাগুলো ব্যবহার করা শুরু করে?"

অনেকে মনে করেন, পরমাণু বোমা কখনই ব্যবহৃত হবে না, মানুষ এতবড় ভুল কখনই করবে না। তাদের এই মনে করার পেছনে শক্ত কোনো যুক্তি নেই। যুক্তি বলতে এটুকুই যে, পরমাণু যুদ্ধের পশ্চাতে যেহেতু শত্রু-মিত্র কেউই রেহাই পাবে না, কাজেই নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে হলেও মানুষ এই ভয়ংকরতম যুদ্ধ শুরু করা থেকে বিরত থাকবে।' কথাটা অমূলক নয়। গত ৭০ বছর মানবজাতি পরমাণু যুদ্ধ শুরু করেনি, তার কারণ কিন্তু এটাই। এই পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করে হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমামুযযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী তাঁর রচিত "এ ইসলাম ইসলামই নয়" বইয়ে লিখেছেন- "যুক্তরাষ্ট্র জানে সে যদি তার শত্রু রাশিয়াকে ধ্বংস করতে চায় তবে যতক্ষণে তার আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্র রাশিয়াতে পৌঁছে রাশিয়ার নর নারী শিশুদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে, ততক্ষণে রাশিয়ার ক্ষেপনাস্ত্রও আমেরিকার দিকে অর্ধেক রাস্তা পার হয়ে আসবে এবং আমেরিকারও ঠিক সেই দশাই ঘটবে। . . . নিজের পরিণামের এই ভয়ই শুধু পৃথিবী ধ্বংসকারী অস্ত্রগুলোকে ব্যবহার থেকে

মানুষকে বিরত রেখেছে। যান্ত্রিক 'সভ্য' ভাষায় এরই নাম (Deterent), দা'তাত।"

কিন্তু এই দা'তাত কতদিন যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? দু'জন শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি একে অপরের দিকে বন্দুক তাক করে রেখেছে, কেউ ট্রিগার টানছে না, কারণ ট্রিগার টানলে দুজনেই মারা যাবে, এই অবস্থা কি অনন্তকাল চলতে পারে? কখনই নয়, কাউকে না কাউকে ট্রিগার টানতেই হবে। হতে পারে তা চলমান রুশ ইউক্রেন ইস্যু, বা তারচেয়েও ঠুনকো কোনো ইস্যুতেও, ভেঙে যেতে পারে ৭০ বছরের দা'তাত। সেক্ষেত্রে কী ঘটতে পারে মানবজাতির? এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। রয়েছে শত শত গবেষণা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা। আজকের এই লেখায় পাঠকদের জন্য আমরা এসব গবেষণা থেকে উঠে আসা তথ্য-উপাত্তের আলোকে পরমাণু বোমা হামলার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করব।

- **কেমন হবে পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহতা:**

একটি বিষয় শুরুতেই জেনে রাখা দরকার- পরমাণু বোমা হামলার ঘটনা সীমিত বা আঞ্চলিক পরিসরে হবার সম্ভাবনা খুবই কম। এর ব্যবহার হওয়া মানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়া। আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানেই সারা বিশ্বব্যাপী যার যতটা পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে তার ব্যবহার হবে, শুরুতে বা শেষে যখনই তা হোক না কেন।

এক হিসাব অনুযায়ী রাশিয়ার ইন্টার কন্টিনেন্টাল-রেঞ্জ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রে স্থাপিত পারমাণবিক বোমা প্রায় ৩০ মিনিটেই যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানতে সক্ষম। প্রায় একই ধরনের সক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোরও রয়েছে। যদিও স্টার্ট চুক্তিতে এ ধরনের অস্ত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। যদি পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে বিশ্বের ৪ হাজার ৫০০ মহানগরী ধ্বংস করতে মাত্র ১৩ হাজার ৫০০ পারমাণবিক বোমাই যথেষ্ট হবে।

১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা, নাগাসাকিতে আমেরিকা যে "লিটল বয়" নামে পারমাণবিক বোমাটি ফেলেছিল, সেই বিস্ফোরণের ঘটনা থেকে নিশ্চয়ই আপনারা কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পারছেন যে পারমাণবিক বোমার ভয়াবহতা কেমন হতে পারে। আচ্ছা, কী ঘটতে পারে যদি এখনকার যুগের কোনো ব্যস্ত শহরে সেই লিটল বয়কে ফেলা হয়! কতটুকু এলাকাজুড়ে বিস্ফোরিত হবে সেই বোমাটি! এর ভয়াবহতা বা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমন হবে? পরবর্তী কত বছর সময় লাগবে সব ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে শহরটিকে আবার তার আগের রূপে ফিরিয়ে আনতে?

- **এক্ষেত্রে তিনটি ধাপে একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা যায়:**

বোঝার সুবিধার জন্য আমরা জাপানের হিরোশিমার "লিটল বয়"-কে উদাহরণ হিসেবে নিব।

কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হবে বা এর ভয়াবহতা কেমন হবে এটা নির্ভর করবে শহরের উপাদানগুলোর উপর। সাধারণত একটি রাজধানী শহরে বিপুল পরিমাণ শিল্প কারখানা, অসংখ্য যানবাহন, লক্ষ লক্ষ টন প্লাস্টিক এবং শহর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্যাস লাইন তো থাকবেই। এগুলোই যথেষ্ট একটি শহরকে ছাই করে দিতে।

যেকোনো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার মতো প্রযুক্তি মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছে। কিন্তু মনুষ্য সৃষ্ট এই দুর্যোগের সামনে কোনো প্রযুক্তিই কাজেই আসবে না। আগুনের বলয় তৈরীর ঠিক পরের সেকেন্ডেই ২ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের সবকিছুতেই আগুন লেগে যাবে। যেন এই মাত্রই একটি আলোর ঝলকানি দেখলেন আর ঠিক পরের সেকেন্ডেই দেখলেন আপনার সামনে আগুন লেগে গেছে। শুধু আপনি একা না আপনার আশেপাশে যা কিছু অর্থাৎ গাছপালা, বিদ্যুতের খুঁটি সবকিছুই আগুনে পুড়ে গেছে। আরো খারাপ অবস্থা হবে যখন গ্যাসের সিলিন্ডারগুলো একে একে ফাটতে শুরু হবে। প্রায় ৫ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে পারমাণবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে যাবে।

প্রথম ধাপ: একটি দৃশ্য কল্পনা করুন। একটি শান্ত শহরে মানুষজন চলাফেরা করছে। শুরু হয়ে গেছে প্রতিদিনের ব্যস্ততা। যে যার কর্মস্থলে যাচ্ছে, বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে। এমন সময় একটি পারমাণবিক বোমা এসে শহরের বুকে আছড়ে পড়ল। এরপর যা হবে তার জন্য এক সেকেন্ডের কম সময় লাগবে। ১৮০ মিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট আগুনের একটি বলয় তৈর হবে। এই বলয়ের মধ্যে যা যা থাকবে তা সব বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। যেন আলোর এক সুনামি এসে সবকিছু গ্রাস করে নিচ্ছে। এই বলয়ের সামনে কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। প্রচুর উত্তপ্ত পাতিলের মধ্যে পানির একটি ফোটা ছেড়ে দেয়ার মতো হবে এই ব্যাপারটি। মুহুর্তেই বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। বিস্ফোরণের এক সেকেন্ডের মধ্যে আরও যা ঘটবে তাহলো- ১.৭ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে যা যা আছে সবকিছুই ভেঙ্গে গুড়িয়ে যাবে। কংক্রিটের দেয়ালও এর সামনে কিছুই নয়।

যেকোনো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার মতো প্রযুক্তি মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছে। কিন্তু মনুষ্য সৃষ্ট এই দুর্যোগের সামনে কোনো প্রযুক্তিই কাজেই আসবে না। আগুনের বলয় তৈরীর ঠিক পরের সেকেন্ডেই ২ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের সবকিছুতেই আগুন লেগে যাবে। যেন এই মাত্রই একটি আলোর ঝলকানি দেখলেন আর ঠিক পরের সেকেন্ডেই দেখলেন আপনার সামনে আগুন লেগে গেছে। শুধু আপনি একা না আপনার আশেপাশে যা কিছু অর্থাৎ গাছপালা, বিদ্যুতের খুঁটি সবকিছুই আগুনে পুড়ে গেছে। আরো খারাপ অবস্থা হবে যখন গ্যাসের সিলিন্ডারগুলো একে একে ফাটতে শুরু হবে। প্রায় ৫ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে পারমাণবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে যাবে। এগুলো কেবলমাত্র বোমা আঘাত হানার প্রথম ২ সেকেন্ডের কথা। ধীরে ধীরে অবস্থা আরো ভয়াবহতার দিকে এগুবে।

২য় ধাপ: যে স্থানে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে সেখান থেকে প্রায় সাড়ে ৪ কিলোমিটার দূর থেকে আপনি দেখতে পাবেন কোথায় যেন ভয়াবহ আগুন লেগেছে। আর শুনতে পাবেন বিকট আওয়াজ। হতবিহ্বল হয়ে আপনি লক্ষ করবেন- ২০ হাজার ফুট উচ্চতার একটি মাশরুম আকৃতির ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে। ততক্ষণে প্রায় ৩০ সেকেন্ড পার হয়ে গেছে। ২ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে মাসরুমটি ছড়িয়ে গেছে। আপনি যদি জানালা দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখতে থাকেন তাহলে কিন্তু বিশাল ভুল করবেন। কারণ ধ্বংসলীলা এখনো শেষ হয়ে যায়নি। মাশরুমটি থেকে শক ওয়েভ ধেয়ে আসছে আপনার দিকে। এবং এটি মাত্রা এত বেশি যে আপনার জানালার কাঁচ ভেঙ্গে দিতে সক্ষম।

একটু পরেই দেখবেন পাঁচ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে কালো মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে। তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়বে শহর জুড়ে। তারপর শুরু হবে তেজস্ক্রিয় কালো বৃষ্টি। বিষাক্ত বাতাস চারপাশে ছেয়ে যাবে। আর এসবকিছুই হবে বোমা বিস্ফোরণের কয়েক মিনিটের মধ্যেই। এটাই হচ্ছে প্রাথমিক আঘাত।

৩য় ধাপ: তৃতীয় ধাপে আপনি যা দেখতে পাবেন তা দেখার পর আপনার কাছে মৃত্যুই শ্রেয় মনে হবে। বিস্ফোরণের কয়েক মিনিট পর আপনি দেখতে পাবেন- পুরো শহর কালো অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। বিষাক্ত বাতাস ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আশেপাশের সমস্ত ঘড়বাড়ি রাস্তাঘাট সব ভেঙ্গে গেছে। সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ। খাবার জন্য বিশুদ্ধ পানিও নেই। যারা বেঁচে আছেন তারা ধ্বংসস্তুপের মধ্যে আটকা পড়ে আছেন। আশেপাশের

থেকে কোনো সাহায্য আসবে সেই আশাও নেই। পারমাণবিক বিস্ফোরণ, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, দাবানল সব একসাথে হয়েছে। সমস্ত রাস্তাঘাট ভেঙ্গে গেছে। রাস্তাঘাট, ট্রেনলাইন, বিমানের রানওয়ে সবকিছু যখন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তখন যোগাযোগ করার মতো কোনো ব্যবস্থাই নেই। দূরবর্তী শহরগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে হবে সাহায্যের আশায়। কিন্তু আকাশপথে যারা সাহায্যের জন্য আসবে তারাও তেজস্ক্রীয় পরিবেশের মধ্যে কাজ করায় প্রশিক্ষিত না। ধরুন এর মধ্যেও একজন ব্যক্তিকে উদ্ধার করা সম্ভব হলো, তারপরও তাকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে উঠবে, কারণ ইতোমধ্যেই তার শরীরে ঢুকে গেছে তেজস্ক্রীয় রশ্মি, যা ক্যান্সার সৃষ্টি করে ফেলেছে। শুধু এক-দুজন নয়, তেজস্ক্রীয়তার জন্য পুরো শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়বে ক্যান্সার।

আসলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা লিখে শেষ করা যাবে না। যতই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেখা হোক, এর প্রকৃত ভয়াবহতা তুলে ধরা অসম্ভব। আপাতত আমরা এটুকু বুঝতে পারি- অন্য কোনো যুদ্ধ-মহাযুদ্ধের চেয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে হাজারগুণ বেশি বিধ্বংসী! বিজ্ঞানী আইনস্টাইন হয়ত যথার্থই বলেছেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ করার জন্য মানবজাতির কাছে হয়ত পাথর আর লাঠি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ধরুন এতকিছুর পরও কিছু মানুষ বেঁচে থাকলো। তারা দেখতে পাবে আরেক ভয়াবহ দৃশ্য। দৃশ্যটি কল্পনা করুন- পৃথিবী ছেয়ে গেছে ধূলিধূসর অন্ধকারে। জমিনে পৌঁছায় না সূর্যের আলো। সূর্যের আলো না পৌঁছার ফলে শীতল হয়ে বরফে ঢেকে গেছে বিস্তৃর্ণ ভুখন্ড। মনে হচ্ছে কোনো হলিউডের সাইন্স ফিকশন মুভির কথা বলছি, তাই না? পরাশক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা এবং রাশিয়া যদি তাদের মজুদে থাকা ৪০০০ পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় তাহলে ঠিক এরকম অবস্থাই সৃষ্টি হবে।

এত বড় সংখ্যা বাদ দিলাম তারপরেও মাত্র ১০০ টি পারমাণবিক বোমাও যদি বিস্ফোরিত হয় তাহলে পৃথিবীর জলবায়ুর মানচিত্রও বদলে যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত জলবায়ু বিশ্লেষক এলান রবক বলেছেন, "পৃথিবীতে যত পারমাণবিক অস্ত্র মজুদ আছে তার অর্ধেকের অর্ধেকও যদি বিস্ফোরিত হয় তাহলে পরিণতি একই দাঁড়াবে। বোমার প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে যদি কেউ বেচেঁও যায় তাহলে পরোক্ষ প্রভাব থেকে কেউ রক্ষা পাবে না। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই প্রায় ৭ লক্ষ টন ধুলিকনা আকাশে ছড়িয়ে পড়বে। আকাশ আছন্ন করে ফেলবে এবং সূর্যের আলো পৌছাতে পারবে না। এমন অবস্থা চলবে প্রায় কয়েক বছর পর্যন্ত। ভূপৃষ্ঠে সূর্যের আলো না পৌছানোর কারণে তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ৫০ ডিগ্রি সেলাসিয়াসে নেমে আসবে। অপর দিকে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০-১৫ কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা দাঁড়াবে প্রায় ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। এককথায় পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। সামুদ্রিক অঞ্চলে সৃষ্টি হবে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। এছাড়াও পরমানবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্ট অগ্নিপিণ্ড থেকে যে বিপুল পরিমাণ নাইট্রোজেন অক্সাইড সৃষ্টি হবে তা ওজন স্তরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে। এর ফলে সূর্যের আলোর সঙ্গে ভূপৃষ্ঠে প্রবেশ করবে অতিবেগুনি রশ্মি।

এক কথায় বলতে হয়- কোনো প্রাণী বোমার সরাসরি আঘাত থেকে রক্ষা পেলেও পরোক্ষ প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন হবে। বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, বোমা বিস্ফোরণের প্রভাব প্রায় ১০ বছর পর্যন্ত তীব্রভাবে বিরাজ করবে এবং ১০ বছর পর হয়ত পৃথিবী ঘুরে দাঁড়ানো শুরু করতে পারে।

আসলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা লিখে শেষ করা যাবে না। যতই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেখা হোক, এর প্রকৃত ভয়াবহতা তুলে ধরা অসম্ভব। আপাতত আমরা এটুকু বুঝতে পারি- অন্য কোনো যুদ্ধ-মহাযুদ্ধের চেয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে হাজারগুণ বেশি বিধ্বংসী! বিজ্ঞানী আইনস্টাইন হয়ত যথার্থই বলেছেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ করার জন্য মানবজাতির কাছে হয়ত পাথর আর লাঠি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট।

ধর্ম কি দেশীয় সংস্কৃতির প্রতিপক্ষ?

মসীহ উর রহমান

আমাদের দেশের অনেক আলেম ও মুফতির দৃষ্টিতে চৈত্র সংক্রান্তি, পহেলা বৈশাখ, নবান্ন ইত্যাদি আঞ্চলিক উৎসব পালন করা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির অনুসরণ। সুতরাং এগুলো শেরক। তাদের জ্ঞানের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই আমরা দু'টি দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনার চেষ্টা করছি - (ক) ইসলামের আকিদাগত দৃষ্টিকোণ থেকে, (খ) শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে।

- **(ক) ইসলামের আকিদাগত দৃষ্টিকোণ থেকে:**

আকিদাগত দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছে। তাই এতে যে বিধানগুলো স্থান পেয়েছে সেগুলো কোনোটাই কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা বা আঞ্চলিকতার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এর সব বিধান সব মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য ও গ্রহণীয়। প্রতিটি জনপদের মানুষের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে যা তাদের ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিশীল, যা গড়ে ওঠে হাজার হাজার বছরের সামজিক-রাজনৈতিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে। তাই ইসলামে একটি বিশেষ অঞ্চলের সংস্কৃতিকে আরেকটি অঞ্চলের মানুষের উপর চাপিয়ে দেয় নি, তেমনি কোনো এলাকার মানুষের আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে নিষিদ্ধও করা হয় নি। ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে কেবল অশ্লীলতা, অন্যায় ও আল্লাহর অবাধ্যতাকে। সেই নিরীখে বাংলাদেশ ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলে আবহমান কাল থেকে চলে আসা নবান্ন উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তি বা পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি কোনো উৎসবই হারাম বা নিষিদ্ধ হতে পারে না। তবে এই উৎসবগুলোর নামে যদি অশ্লীলতা ও অন্যায়ের বিস্তার ঘটানো হয়, সেটা অবশ্যই নিষিদ্ধ। কেননা তার দ্বারা মানবসমাজে অশান্তি সাধিত হবে এবং যা কিছুই অশান্তির কারণ তা-ই যে কোনো মানবকল্যাণকামী জীবনব্যবস্থায় নিষিদ্ধ হওয়ার দাবি রাখে।

আল্লাহ এমন একটি জীবনবিধান দিয়েছেন যার নাম দীনুল হক অর্থাৎ সত্যভিত্তিক জীবনব্যবস্থা; দীনুল ফেতরাহ বা প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিশীল জীবনব্যবস্থা; দীনুল ওয়াসাতা অর্থাৎ ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা; দীনুল কাইয়্যেমাহ বা আবহমান ও চিরন্তন জীবনব্যবস্থা। এই দীনের মূলনীতিগুলো দীনের নামের মধ্যেই প্রকাশিত হচ্ছে অর্থাৎ এই জীবনব্যবস্থা সত্যপূর্ণ, প্রাকৃতিক ও চিরন্তন নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ। এই দীনের একমাত্র কাম্য হলো মানুষের সার্বিক শান্তি। তাই এর নাম আল্লাহ দিয়েছেন ইসলাম, আক্ষরিক অর্থেই শান্তি। ইসলামের প্রতিটি বিধানই তাই শান্তির লক্ষ্যে প্রণীত, এর প্রতিটি বিধানই মানবপ্রকৃতি, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা, প্রতিটি বিধানই ভারসাম্যযুক্ত এবং চিরন্তন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

- **আরবীয় সংস্কৃতিকে ইসলাম বলে প্রচলন করা:**

আল্লাহর শেষ রসুল আরবে এসেছেন, তিনি আরবের মানুষ, তাঁর আসহাবগণও আরবের মানুষ। প্রতিটি এলাকার যেমন নিজস্ব একটি সংস্কৃতি থাকে, নিজস্ব পোষাক, ভাষা, আচার-আচরণ, রুচি-অভিরুচি থাকে তেমনি তাঁদেরও ছিল। আমাদের দেশের একজন নেতা বাংলাতে কথা বলবেন, বাংলাদেশের পোশাক পরবেন এটাই স্বাভাবিক। তেমনি রসুলাল্লাহ ও তাঁর সাহাবীরা আরবীয় পোশাক পরেছেন, আরবিতে কথা বলেছেন, আরবীয় খানা-খাদ্য খেয়েছেন। এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না, যে সারা দুনিয়ার মানুষকেই ঐভাবে আরবিতে কথা বলতে হবে, আরবীয় জোব্বা, পাগড়ি পরিধান করতে হবে, খোরমা-খেজুর খেতে হবে। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি আরবীয় রীতি নীতি অনুসরণ করে তবে সে তা করতে পারে, কেননা যে কোনো অঞ্চলের সংস্কৃতি গ্রহণ করার স্বাধীনতা সকলের আছে।

কিন্তু আমাদের সমাজে ইসলামী সংস্কৃতি বলতে যেটা বোঝানো হয় সেটা আসলে অনেক ক্ষেত্রেই আরবীয় সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির বাইরে অন্য সকল অঞ্চলের শিল্প-সংস্কৃতি, পোশাক-আশাক, আচরণকে অনৈসলামিক বলে গণ্য করা হয়। যেমন ইসলামের অধিকাংশ আলেমদের সিদ্ধান্তমতে পুরুষের ছতর হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকতে হবে। এখন কেউ যদি ধুতি পরিধান করে তাহলেও কিন্তু তার ছতর আবৃত হয়। কিন্তু ধুতি পরাকে কি আলেমরা ইসলামী সংস্কৃতি বলে মেনে নেবেন? না, তারা একে হিন্দুয়ানী পোশাক বলে ঘৃণার চোখে দেখবেন। তারা চান মানুষকে তেমন জোব্বা পরাতে যেটা আরবের লোকেরা পরে থাকেন। আরবিতে কোর'আন হাদিস ছাড়া যে কোনো কিছু লেখা থাকলেও আমরা চুমু খেয়ে মাথায় করে রাখি।

সুতরাং বোঝা গেল আরবীয় সংস্কৃতিকেই আমাদের সমাজে ইসলাম বলে গণ্য করা হচ্ছে।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসি। প্রতিটি অঞ্চলের সংস্কৃতির বিনির্মাণে ধর্মের পর সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে সে এলাকার অর্থনীতি। এ দিক থেকে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে কৃষি সংস্কৃতিই বোঝায়। পলিগঠিত জমির কৃষিনির্ভর বাংলার কৃষক ধর্মে হিন্দু হোক আর মুসলিমই হোক, বৌদ্ধ হোক বা খ্রিষ্টানই হোক, তার জীবনের আনন্দ, বেদনা, উৎসব, আশা-নিরাশার সঙ্গে কৃষি ফসলের নিবিড় বন্ধন থাকবে এ কথা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়। নতুন ধান ঘরে তোলার আনন্দ তাই এ অঞ্চলের মানুষের প্রাণের সঙ্গে যুক্ত। বাংলা ফসলি বছরের সঙ্গে এদের ভাত-কাপড়ের সম্পর্ক। তাই চৈত্রসংক্রান্তি, পহেলা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি কৃষিনির্ভর বাঙালির জীবনমানের মানদণ্ড। এই বাস্তবতা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

- **(খ) শরিয়তের মানদণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে:**

এখন দেখা যাক, এই উৎসব উদ্‌যাপন কি ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ না অবৈধ? প্রথম কথা হচ্ছে- আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে কয়েকটি জিনিসকে হারাম করেছেন, সেগুলো হারাম। কিছু খাদ্য আছে হারাম যেমন- শুকর, মদ, মৃত পশু ইত্যাদি। কিছু উপার্জন আছে হারাম যেমন- সুদ, জুয়া খেলা ইত্যাদি। কিছু কাজ আছে হারাম যেমন অশ্লীলতা, রিয়া, অপচয়, অসার কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। কিছু কথা আছে হারাম যেমন মিথ্যাচার, গীবত ইত্যাদি। বিয়ে করার জন্য কিছু নারী আছে হারাম যেমন মা, বোন, ফুপু, খালা ইত্যাদি। এসবের বাইরে যা কিছু আছে তা বৈধ বা হালাল। কোনো বিষয় (যেমন একটি উৎসব) হালাল না হারাম তা নির্ভর করে তার উদ্দেশ্য ও ফলাফলের উপর। কোনো কাজের উদ্দেশ্য বা পরিণতি যদি মানুষের অনিষ্টের কারণ হয় তাহলে সেটা কখনোই ইসলাম সমর্থন করে না। আর যদি তার উদ্দেশ্য হয় মানুষের কল্যাণ বা ইষ্টসাধন তাহলে একে হারাম ফতোয়া দেওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

আমরা পবিত্র কোর'আনের সুরা আন'আমের ১৪১ নম্বর আয়াতটি থেকে কৃষি-সংস্কৃতির দিবস উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে আল্লাহর নীতিমালা জানতে পারি। এ আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

তিনিই শস্যক্ষেত্র ও সবজি বাগান সৃষ্টি করেছেন, এবং সে সমস্ত লতা জাতীয় গাছ যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয়, এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না এবং খেজুর গাছ ও বিভিন্ন আকৃতি ও স্বাদের খাদ্যশস্য। এবং জলপাই জাতীয় ফল ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন- যা একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন তা খাওয়ার উপযোগী হয় এবং ফসল তোলার দিনে এগুলোর হক আদায় করো। কিন্তু অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।

এ আয়াতে তিনটি শব্দ লক্ষণীয়, (ক) ফসল তোলার দিন, (খ) হক আদায় করা, (গ) অপচয় না করা। কোর'আনের প্রসিদ্ধ ইংরেজি অনুবাদগুলোতে (যেমন আল্লামা ইউসুফ আলী, মারমাডিউক পিকথল) ফসল তোলার দিনের অনুবাদ করা হয়েছে ঐধৎাবংঃ ফধু. আয়াতটিতে আমরা কয়েকটি বিষয় পাচ্ছি:

১. কৃষক যা কিছু চাষ করে তা ফল বা ফসল যাই হোক, সেটা কাটার দিন (ইয়াওমুল হাসাদ) এর হক আদায় করতে হবে। সেই হক হচ্ছে- এর এক একটি নির্দিষ্ট অংশ হিসাব করে গরিব মানুষকে বিলিয়ে দিতে হবে। ফসলের এই বাধ্যতামূলক যাকাতকে বলা হয় ওশর।

২. যেদিন নতুন ফসল কৃষকের ঘরে উঠবে সেদিন স্বভাবতই কৃষকের সীমাহীন আনন্দ হবে। এই আনন্দের ভাগিদার হবে গরিবরাও। কেননা তারা ফসলের অধিকার পেয়ে সন্তুষ্ট হবে, তাদের দারিদ্র্য ঘুঁচে যাবে। কিন্তু আল্লাহ সাবধান করে দিলেন এই আনন্দের আতিশয্যে যেন কেউ অপচয় না করে।

আমাদের দেশে ফসল কাটার দিনে আনন্দ করা হয়, বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন পার্বণ পালন করা হয়। এ আয়াতের প্রেক্ষিতে দেখা গেল এই দিবসগুলোতে উল্লিখিত কাজগুলো করা ফরদ। যারা একে অস্বীকার করবে তারা আল্লাহর বিধানকেই অস্বীকার করল। কেবল ইসলামের শেষ সংস্করণ নয়, মুসা (আ.) এর উপর যে শরিয়ত নাজেল হয়েছিল সেটিতেও ছিল উৎসব পালনের নির্দেশ। আল্লাহ বলেন,

"Celebrate the Festival of Harvest, when you bring me the first crops of your harvest." Finally, celebrate the Festival of the Final Harvest at the end of the harvest season, when you have harvested all the crops from your fields. (Exodus 23:16)

"তুমি ফসল কাটার উৎসব অর্থাৎ ক্ষেতে যা কিছু বুনেছ তার প্রথম ফসলের উৎসব পালন করবে। বছর শেষে ক্ষেত থেকে ফসল সংগ্রহ করার সময় ফলসঞ্চয় উৎসব পালন করবে। (তওরাত: এক্সোডাস ২৩: ১৬) সুতরাং ধরে নেওয়া যায় ইসলামের পূর্বের

সংস্করণগুলোতেও নবান্ন বা ফসল কাটার উৎসব পালন করার হুকুম ছিল এবং সে মোতাবেকই বিভিন্ন জনপদে এই উৎসবগুলো প্রচলিত হয়েছে।

- **বর্তমানে যেভাবে দিবসগুলো পালিত হচ্ছে:**

পহেলা বৈশাখও ফসলি বছরের প্রথম দিন হিসাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখন কথা হচ্ছে, বর্তমানে আমাদের দেশে যেভাবে (Process) পহেলা বৈশাখ পালন করা হয় সেটা কী উদ্দেশ্যে করা হয়? তাতে কি আল্লাহর দেওয়া দরিদ্রের অধিকার ও আনন্দ উদ্‌যাপনের মানদণ্ড রক্ষিত হয়?

না। বর্তমানে পহেলা বৈশাখের নামে প্রকৃতপক্ষে যা করা হয় তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণই বাণিজ্যিক। আমরা জানি যে, ঈদ, বড়দিন, পূজা, প্রবারণা ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় উৎসব হলেও বাস্তবে এগুলো কিছু

অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি উন্নত দেশে উৎসবের নামে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ও বরকত ফল-ফলাদির কী নিদারুণভাবে অপচয় করা হচ্ছে। এই কথাটিই আল্লাহ বলেছেন যে, দিবস পালন করো কিন্তু অপচয় করো না।

পহেলা বৈশাখের সময় নদী থেকে ধরা এসব বড় আকারের ইলিশের দাম ১৫-২০ হাজার টাকাও ছাড়িয়ে যায়। একটি উৎসবকে সামনে রেখে এই যে ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিল আর অপচয়ের প্রদর্শনী, আল্লাহ এটা অপছন্দ করেন। তিনি চান, উৎসবের দিনগুলোতে মানুষ দুঃখী, দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াবে, তাদের দুঃখ নিবারণের জন্য চেষ্টা করবে। এর মাধ্যমেই দিবসটি সার্থকতা লাভ করবে।

স্বার্থান্বেষী শ্রেণির বাণিজ্যের উৎস ছাড়া কিছুই নয়। যেমন ঈদ আসার একমাস আগে থেকেই শুরু হয় কেনাকাটা, উৎসবের নামে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি অপচয়ের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি সারা রমজান মাস তারাবি পড়িয়ে, মিলাদ পড়িয়ে, ফজিলত ও সদকায়ে জারিয়ার ওয়াজ করে - বহু উপায়ে জোব্বার পকেট ভারি করেন। ঈদের বকশিশ তো আছেই। টিভি চ্যানেলগুলো ঈদকে সামনে রেখে সাতদিনের অনুষ্ঠানমালা সাজায় যার স্পন্সর আদায় করে তারা কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নেয়। মুদি দোকান থেকে শুরু করে কোমল পানীয়, ফ্রীজ, টেলিভিশন, মোবাইল কোম্পানিগুলোর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে। বাজারের প্রতিটি পণ্য ও সেবার সঙ্গে যুক্ত হয় ঈদ অফার। অর্থাৎ ঈদের উদ্দেশ্য ধর্মপালন নয়, মানুষের কল্যাণসাধনও নয়, গরিবের মুখে হাসি ফোটানোও নয়, নিরেট উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক স্বার্থ হাসিল। একইভাবে পহেলা বৈশাখের উদ্দেশ্যও

বাণিজ্যিক। একটি ৫০০ টাকার ইলিশের দাম হয়ে যায় ৫,০০০ টাকা। যারা সারা বছর ফাস্ট ফুডে অভ্যস্ত, তারা এই একটা দিন বাঙালি পোশাক পরে, মাটির বাসনে শুকনো মরিচ দিয়ে পান্তা-ইলিশ খাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে। প্রতিটি লোকজ জিনিসের দাম হয়ে যায় আকাশচুম্বি। একদিনের এই বাঙালিয়ানা যেন তাদের একদিনের মাতৃভক্তি, দিন শেষ ভক্তি শেষ। এটা যে বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি তাদের অবজ্ঞা ও অবমাননারই বহিঃপ্রকাশ তা চিন্তা করার অবকাশও দিচ্ছে না বৈশাখ ব্যবসায়ীরা। আর আমাদের তারুণ্যও উন্মাদনায় মত্ত হয়ে কর্পোরেট বাণিজ্যের তেলের যোগান দিয়ে যাচ্ছে। ২০১৭ সালের ১১ এপ্রিলে এক সংবাদ সম্মেলনে দেশবাসীকে পহেলা বৈশাখে ইলিশ না খাওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, "আপনারা ইলিশ খাবেন না, ইলিশ ধরবেন না।" এ সময় প্রধানমন্ত্রী পহেলা বৈশাখের খাদ্য তালিকা হিসেবে- খিচুড়ি, সবজি, মরিচ ভাজা, ডিম ভাজা ও বেগুন ভাজার কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু এতে তেমন কোনো লাভ হয়নি।

মানুষ কেবল দেহ নয়, তার আত্মা আছে। দেহের যেমন খাদ্য প্রয়োজন তেমনি আত্মার প্রয়োজন নির্মল আনন্দ। আমরা অস্ট্রেলিয়ার শিনচিলা শহরে প্রতিবছর উদযাপিত তরমুজ উৎসব বা ওয়াটামেলন ফেস্টিভ্যালের কথা জানি। সেদিন হাজার হাজার তরমুজের রস দিয়ে একটি পিচ্ছিল পথ তৈরি করে তাতে স্কী করা হয়। একইভাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ফসল যেমন আঙ্গুর, টমাটো ইত্যাদি নিয়েও হারভেস্ট ফেস্টিভ্যালে অপচয়ের মহোৎসব করা হয়। আল্লাহ খাদ্য ও সম্পদের এই অমানবিক অপচয়কে নিষিদ্ধ বা হারাম করেছেন, কিন্তু আনন্দ করতে বাধা দেন নি। আল্লাহ বলেছেন, "খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না; কারণ আল্লাহ তাআলা অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না। হে রসুল! আপনি বলে দিন, কে হারাম করেছে সাজসজ্জা গ্রহণ করাকে--যা আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন?"

অনেক অশ্লীলতারও বিস্তার ঘটছে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। যখন কোনো সাংস্কৃতিক উৎসব পালনের নামে অন্যায় ও অশ্লীল অপসংস্কৃতির চর্চার পথ মসৃণ করা হয়, কোনো বিষয়ে সীমালংঘন এবং অত্যাধিক বাড়াবাড়ি দেখা দেয়, তখন প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এর বিরুদ্ধে রক্ষণশীল শ্রেণী ও আলেমদের বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হওয়াটা খুবই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। পাশাপাশি নিজেদের আরবীয় সংস্কৃতির বাইরে কোনো কিছুকে ইসলামী সংস্কৃতি বলে মেনে নিতে না পারার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এই উৎসবপালনকেই হারাম ও বে'দাত বলে ফতোয়া দিতে ধর্মবেত্তাদের রসদ যুগিয়েছে।

মানুষ কেবল দেহ নয়, তার আত্মা আছে। দেহের যেমন খাদ্য প্রয়োজন তেমনি আত্মার প্রয়োজন নির্মল আনন্দ। আমরা অস্ট্রেলিয়ার শিনচিলা শহরে প্রতিবছর উদযাপিত তরমুজ উৎসব বা ওয়াটামেলন ফেস্টিভ্যালের কথা জানি। সেদিন হাজার হাজার তরমুজের রস দিয়ে একটি পিচ্ছিল পথ তৈরি করে তাতে স্কী করা হয়। একইভাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ফসল যেমন আঙ্গুর, টমাটো ইত্যাদি নিয়েও হারভেস্ট ফেস্টিভ্যালে অপচয়ের মহোৎসব করা হয়। আল্লাহ খাদ্য ও সম্পদের এই অমানবিক অপচয়কে নিষিদ্ধ বা হারাম করেছেন, কিন্তু আনন্দ করতে বাধা দেন নি। আল্লাহ বলেছেন, "খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না; কারণ আল্লাহ তাআলা অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না। হে রসুল! আপনি বলে দিন, কে হারাম করেছে সাজসজ্জা গ্রহণ করাকে--যা আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন?" (সুরা আরাফ ৩১-৩২)। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ আছে যারা দুর্ভিক্ষপীড়িত। সেই সব ক্ষুধার্ত মানুষের হক আছে এই ফল ও ফসলে। এই নবান্নে, পয়লা বৈশাখের উৎসবে, চৈত্রসংক্রান্তির পার্বনে, তাদের সেই হক আদায় করা হলেই এই উৎসব হবে পবিত্র দিন। উৎসব আর ঈদের মাঝে অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই। শুধু নববর্ষের নামে আজ যে নিদারুণ অপচয় হচ্ছে, বাণিজ্যিক স্বার্থ হাসিল করা হচ্ছে অর্থাৎ এর প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা হয়েছে, তা না করে যদি সেই অর্থ গরিব-দুখী মানুষকে প্রদান করা হতো অর্থাৎ শষ্য, ফলমূল ইত্যাদি সকলে মিলে ভাগাভাগি করে খেত, তাহলে নবান্ন আর পহেলা বৈশাখ পালন এবাদতে পরিণত হতো।

লেখক: আমীর, হেযবুত তওহীদ

রসুলাল্লাহর (সা.) যুগে নারীদের ঈদ

রুফায়দাহ পন্নী

ঈদ মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আনন্দের দিন। আর ঈদের দিনের সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে ঈদগাহে দিয়ে ঈদের সালাহ কায়েম করা। মুসলিম উম্মাহর অর্ধেক জনগোষ্ঠীই নারী। ঈদের আনন্দে তাদেরও পূর্ণ অধিকার আছে। এমন নয় যে নারীরা কেবল মজাদার খাবার রান্না করবে আর পুরুষরা ফুর্তিতে ঘুরে বেড়াবে। আনন্দ বিষয়টাই এমন যে তা যত ভাগাভাগি করা যায় ততই বেড়ে যায়। ঈদের দিন কোনো অভাবী মানুষ যেন আনন্দের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত না থাকে সেজন্য ঈদুল ফিতরের সময় সদকাতুল ফিতর অর্থাৎ ফেতরা দেওয়ার নির্দেশ আছে। একইভাবে ঈদুল আজহায় আছে কোরবানীর পশুর একভাগ নিজেরা রেখে বাকি দুইভাগই আত্মীয় ও দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ।

সুতরাং ঈদের আনন্দে নারীদেরও সম অধিকার রয়েছে। ঈদের দিন প্রথম আনন্দ হচ্ছে ঈদগাহে গিয়ে সালাহ কায়েম করা। রসুলাল্লাহর সময় মদীনার নারী পুরুষ সকলেই ঈদের সালাতে অংশ গ্রহণ করতেন। উম্মে আতিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলাল্লাহ (সা.) আমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, নারীরা যেন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহায় নামাজের জন্য ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং সালাতে অংশগ্রহণ করেন। প্রাপ্ত বয়স্কা, ঋতুবতী ও গৃহবাসিনীসহ সবাই। তবে ঋতুবতী নারীরা নামাজ আদায় থেকে বিরত থাকবে। তারা কল্যাণ ও মুসলিমদের দোয়ায় অংশ নেবে।

রসুলাল্লাহর এই নির্দেশ শুনে উম্মে আতিয়া (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের মাঝে কারো কারো ওড়না নেই। রসুলাল্লাহ (সা.) বললেন, সে তার অন্য বোন থেকে ওড়না নিয়ে ঈদগাহে যাবে (সহিহ মুসলিম)।

নারীরা দল বেঁধে তাকবির বলতে বলতে ঈদগাহে যেতেন। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের সলাত আদায়ের জন্য আল্লাহর রসুল ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, "হে নারী সমাজ! তোমরা দান-সদকা কর। কেননা আমাকে অবগত করানো হয়েছে যে, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী সমাজেরই হবে"।

এ কথা শুনে তারা বলল, হে আল্লাহর রসুল! এর কারণ কী? নবী (সা.) "তোমরা অধিক মাত্রায় অভিশাপ প্রদান করে থাক এবং নিজ স্বামীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে থাক। বুদ্ধি ও দীনদারীতে দুর্বল হবার পরও বিচক্ষণ ও সচেতন পুরুষদের বেওকুফ বানিয়ে দেবার জন্য তোমাদের চেয়ে অধিক পারঙ্গম আমি আর কাউকে দেখিনি"।

> ***ঈদের আনন্দে নারীদেরও সম অধিকার রয়েছে। ঈদের দিন প্রথম আনন্দ হচ্ছে ঈদগাহে গিয়ে সালাহ কায়েম করা। রসুলাল্লাহর সময় মদীনার নারী পুরুষ সকলেই ঈদের সালাতে অংশ গ্রহণ করতেন। উম্মে আতিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলাল্লাহ (সা.) আমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, নারীরা যেন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহায় নামাজের জন্য ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং সালাতে অংশগ্রহণ করেন।***

এ কথা শুনে নারীরা আরয করল, হে আল্লাহ্র রসুল! বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে আমাদের কী দুর্বলতা রয়েছে? নবী (সা.) বললেন, "একজন নারীর সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়"? তারা বলল, জি হ্যাঁ! নবী বললেন, "এটাই হল নারীদের বুদ্ধিমত্তার দুর্বলতা। আর নারীরা ঋতুবতী অবস্থায় সালাহ কায়েম করতে ও সিয়াম পালন করতে পারে না। এটা কি সত্য নয়? তারা উত্তরে বলেন, হ্যাঁ তা-ই। নবী বললেনঃ "এটাই হল তাদের দ্বীনের দুর্বলতা"। (সহীহ বুখারী ৩০৪, মুসলিম ৮০, সহীহাহ্ ১৯০, সহীহ আল জামি ৭৯৮০, ইরওয়া ৯২৪।)

আল্লাহর রসুল (সা.) ছিলেন একজন যোদ্ধা নবী। তিনি তাঁর ১০ বছরের মাদানী জীবনে প্রায় ১০৭ টি যুদ্ধ অভিযান সংঘটন করেছেন। নিজে সেনাপতিত্ব করেছেন ২৭টিতে। তাঁর জীবনের কর্মব্যস্ততার সবচেয়ে বড় অংশ জুড়ে ছিল জেহাদ। ঈদের ময়দানেও যোদ্ধা জাতির ইমাম হিসাবে তাঁর ভূমিকা ছিল সেনানায়কসুলভ। ঈদগাহে গিয়ে তিনি যে স্থানে দাঁড়াবেন তার সম্মুখের ভূমিতে একটি বর্শা বা নেযা পুঁতে রাখার নির্দেশ দিতেন। তারপর সালাহ কায়েম করতেন সেই বর্শার দিকে মুখ করে। জাতি

যেন তার লক্ষ্য ও অভিমুখ থেকে বিচ্যুত না হয়, মোমেন জীবনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হয়, সেটাই ছিল রসুলাল্লাহর ঐকান্তিক বাসনা। যুদ্ধাভিযান সহ প্রত্যেক সফরের সময়ও তিনি এই কাজ করতেন। ইব্‌নু উমার (রা.) বলেন, পরবর্তী শাসকগণও রসুলাল্লাহর এই সুন্নাহর অনুসরণ করে গেছেন। (বুখারী পর্ব ৮ : /৯০ হাঃ ৪৯৪, মুসলিম ৪/৪৭, হাঃ ৫০১)

আল্লাহর রসুল (সা.) ঈদের খোতবাতে কী বলতেন সেটাও হাদিসগ্রন্থে আমরা পাই। একটি বর্ণনায় জানা যায়, রসুলাল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতর ও আযহার দিনে ঈদগাহের উদ্দেশে বের হতেন। তিনি প্রথম কাজ হিসাবে সালাহ কায়েম করতেন। অতঃপর লোকদের দিকে ফিরে দণ্ডায়মান হতেন। লোকেরা নিজ নিজ কাতারে বসে থাকত। তিনি তাদেরকে নসীহত করতেন, অসিয়ত করতেন এবং বিভিন্ন আদেশ দিতেন। কোনো যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার বিষয় থাকলে সেটা সম্পন্ন করতেন। কোন কিছুর আদেশ করার থাকলে তা করতেন।" (হাদিস - আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বুখারী ৯৫৬, মুসলিম ২০৯০)

সম্মুখে এসে আবারও বলতেন। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, আমি নবী (সা.) কে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, নাবী (সা.) ঈদের দিন পুরুষের কাতার থেকে বের হলেন আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল (রা.)। রসুলাল্লাহ (সা.) মনে করলেন যে, দূরে থাকার কারণে বক্তব্য দেওয়ার সময় তাঁর কণ্ঠ মহিলাদের কাছে পৌঁছে নি। তাই তিনি পুনরায় তাঁদের নসীহত করলেন এবং আল্লাহর রাস্তায় দান করার উপদেশ দিলেন। তখন মহিলারা কানের দুল ও হাতের আংটি খুলে দিয়ে দিতে লাগলেন। আর বিলাল (রা.) সেগুলি তাঁর কাপড় পেতে গ্রহণ করতে লাগলেন (সহিহ বোখারি)।

বোখারি শরীফের দুই ঈদ সংক্রান্ত অধ্যায়ে বর্ণনা রয়েছে যে, মায়মুনা (রা.) কোরবানির দিন তাকবীর বলতেন। মহিলারা আবান ইব্‌নু উসমান ও উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)- এর পিছনে তাশরীকের রাতগুলোতে (৯ জিলহজ - ১২ জিলহজ) মসজিদে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে তাকবীর বলতেন, যে তাকবিরটা ঈদের সময় আমরা পুনঃ পুনঃ পাঠ করে থাকি। মনে রাখতে হবে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.) এর

আল্লাহর বিধান হলো, সালাহ শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত পুরুষরা সামনের কাতারে দাঁড়াবে, নারীরা পিছনে কাতার করবে। ঈদের জামাতে উম্মাহর সকল নারী ও সকল পুরুষই অংশগ্রহণ করতেন ফলে জামাত অনেক দীর্ঘ হতো। রসুলাল্লাহর বক্তব্য তাই পিছনের সারিতে অবস্থানরত নারীরা ভালো করে শুনতে পেতেন না। তাই তিনি গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো নারীদের কাতারের

শাসনকাল ছিল রসুলাল্লাহর ওফাতেরও ৮৫ বছর পর। তখনও মসজিদে নারী পুরুষ একত্রে সালাহ কায়েম করতেন ও অবস্থান করতেন।

সালাতের শেষে নারীরা বাড়ি ফিরে গিয়ে যথারীতি রান্নাবান্নার আয়োজন করতেন। আর পুরুষেরা পশু কোরবানিতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। মদিনার আনসার নারীরা খুব সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, আর আম্মা আয়েশাও

(রা.) গান ভালোবাসতেন। তিনি বর্ণনা করেন, মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে (অর্থাৎ জিলহজের ১০, ১১, ১২ তারিখে) আবূ বকর (রা.) আমার গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন ঘরে আমার কাছে দু'টি মেয়ে ছিল। তারা দফ বাজিয়ে নেচে নেচে গান করছিল। তাদের গানের বিষয়বস্তু ছিল বুয়াস যুদ্ধে তাদের পূর্বপুরুষদের বীরত্বগাঁথা বর্ণনা করা। নবী (সা.) তখন চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়েছিলেন। আবু বকর (রা.) এদেরকে ধমক দিলেন। নবী (সা.) তখন মুখ হতে চাদর সরিয়ে বললেন, হে আবু বকর (রাঃ)! এদেরকে গান গাইতে দাও। কেননা, আজ ঈদের দিনও মিনার দিনগুলির অন্তর্ভুক্ত। (সহিহ বোখারি-৩৫২৯)

আল্লাহর রসুল শরীরগঠনমূলক, সাহস, ক্ষিপ্রতা সৃষ্টিকারী ক্রীড়া ভালোবাসতেন এবং সেগুলোর জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন, যেমন ঘোড়দৌড়, কুস্তি, বল্লম চালনা, তীরন্দাজী, দৌঁড় ইত্যাদি।

নির্মল ও সুস্থ বিনোদন মানুষের আত্মিক প্রশান্তি ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য। প্রাকৃতিক নিয়মের উপর ভিত্তি করে প্রণীত দীন ইসলামও চায় না মানুষ সব সময় গোমড়ামুখো হয়ে বসে থাকুক। ইসলাম ভারসাম্য শিক্ষা দেয়। আল্লাহর রসুল শরীরগঠনমূলক, সাহস, ক্ষিপ্রতা সৃষ্টিকারী ক্রীড়া ভালোবাসতেন এবং সেগুলোর জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন, যেমন ঘোড়দৌড়, কুস্তি, বল্লম চালনা, তীরন্দাজী, দৌঁড় ইত্যাদি। তিনি মক্কা থেকে হেজরত করে মদিনায় এসে দেখলেন মদিনাবাসীরা বছরের দুটো দিনে ঈদ পালন করে থাকে। সে দিনগুলোতে তারা খেলাধুলা ও আনন্দ করে থাকে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ দু'টি দিন কিসের? সকলেই বললো, জাহিলী যুগে আমরা এ দু' দিন খেলাধূলা করতাম। রসুলাল্লাহ বললেন, মহান আল্লাহ তোমাদের এ দু' দিনের পরিবর্তে উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন। তা হলো, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্বরের দিন। (আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে আবু দাউদ)।

সেই থেকে ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙিনায় বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। বনি আরফিদা নামক একটি সুদানী গোত্রের সাহাবীরা বর্শা খেলায় খুব পারদর্শী ছিলেন। আম্মা আয়েশা (রা.) বলেন, ঈদের দিন সুদানীরা বর্শা ও ঢালের দ্বারা খেলা করত। আমি নিজে রসুলাল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম অথবা তিনিই আমাকে বলেছিলেন যে, তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর পিছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, আমার গাল ছিল তাঁর গালের সাথে লাগান। তিনি তাদের বললেন, তোমরা যা করছিলে তা করতে থাক, হে বনু আরফিদা। পরিশেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার দেখা কি শেষ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হলে চলে যাও। (বুখারী পর্ব ১৩ : /২ হাঃ ৯৪৯, ৯৫০, মুসলিম ৮/৪, হাঃ ৮৯২)। বলা বাহুল্য যে ঈদের দিন বিকেলে মসজিদে নববীতে এই প্রতিযোগিতাগুলো উপভোগ করার জন্য অধিকাংশ মদীনাবাসীই সমবেত হতো। আর এভাবেই ঈদের দিন অতিবাহিত করতেন উম্মতে মোহাম্মদীর নারী ও পুরুষগণ।

বর্তমানের মুসলমানদের চিন্তা ও ধারণায় সেই ঈদের দিনের চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম নিখাঁদ ইতিহাসের ভিত্তিতে। আমরা সেই ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে কত কোটি আলোকবর্ষ দূরে সেটা চিন্তাশীল মানুষ অবশ্যই চিন্তা করবেন। আমাদের সঙ্গে সেই উম্মতে মোহাম্মদীর বড় তফাত হলো- তাদের জীবনের উদ্দেশ্য আর আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের কাছে থাকা ইসলাম আমাদের কাছে থাকা ইসলামও সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করে সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা বিধান করা। আর তাদের দীনের উদ্দেশ্যও ছিল তাই। আর আজ আমাদের কাছে দীনের উদ্দেশ্য কেবল ইহজগতের যাবতীয় ঝুট-ঝামেলা, অন্যায়-অশান্তি থেকে গা বাঁচিয়ে ব্যক্তিগত আমল উপাসনার মাধ্যমে পারলৌকিক মুক্তির প্রচেষ্টা করা। কিন্তু বিকৃত ও বিপরীতমুখী দীন পালন ও জীবন যাপন করে সে বাসনা পোষণ করা কি কেবলই আকাশকুসুম কল্পনা নয়? নিজেরাই বিচার করুন।

লেখক: সম্পাদক, নারী বিভাগ, হেযবুত তওহীদ।

জনতার প্রশ্ন - আমাদের উত্তর

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

• প্রশ্নঃ আমরা দেখি যে হেযবুত তওহীদ অনেক হাদিসের উপর আমল করে না। এর কারণ কি, আপনারা কি হাদিস মানেন না?

উত্তরঃ আমরা কোর'আন ও রসুলাল্লাহর হাদিস দু'টোই মানি। আমাদের বইপত্রে ও বক্তব্যে শত শত হাদিসের উল্লেখ থাকে। এমনকি হেযবুত তওহীদের কর্মসূচিটাও সরাসরি একটি হাদিস থেকে হুবহু সংগৃহীত। সুতরাং আমরা হাদিস মানি না এমন অভিযোগ অজ্ঞতাপ্রসূত। এখন প্রশ্ন করতে পারেন, আমরা সব হাদিস মানি কিনা। এমন প্রশ্নের জবাবে আমরা বলব, আসলে সব হাদিস মানা আদৌ সম্ভব কিনা?

এটা সকলেই জানেন যে, রসুলাল্লাহর ওফাতের একশ বছর পর্যন্ত হাদিস সংগ্রহ ও সংকলন নিষিদ্ধ ছিল। এরপর দ্বিতীয় ওমর, উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের হুকুমে হাদিস সংকলন ও শিক্ষা প্রদান শুরু হয়। প্রথম হাদিস সংকলক ছিলেন ইবনে শিহাব আল জুহুরি যিনি এরপর হাদিস সংগ্রহ, সংকলন ও শিক্ষা প্রদান শুরু করেন। পরবর্তীতে লক্ষ লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করা হয় কিন্তু যাচাই বাছাই করার পর দেখা যায় এসব হাদিসের অধিকাংশই ছিল জাল হাদিস। বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম কুস্তলানীর বক্তব্য অনুযায়ী ইমাম বোখারী সারাজীবনে ছয় লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেন। সেগুলো থেকে অনির্ভরযোগ্য হাদিসগুলো বাদ দেওয়ার পরে মোট হাদিস থাকে মাত্র ৭,২৭৫ টি। এগুলোর মধ্যে আবার একই হাদিস বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। মাত্র একবার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা মাত্র ২,২৩০। মুসলিম শরিফে পুনরুল্লেখ ছাড়া হাদিসের মোট সংখ্যা চার হাজার। একইভাবে ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরিমিজি, ইমাম মালিক প্রমুখ হাদিস সংগ্রাহকগণও লক্ষ লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেছেন যার অধিকাংশই ছিল বানোয়াট ও জাল হাদিস। ইমামগণই সেগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এই বাদ পড়ে যাওয়া হাদিসগুলোকে আবার অন্য অনেক হাদিসগ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে। ইমাম বোখারী যেগুলো বাদ দিয়েছেন সেগুলো ইমাম মুসলিম গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। সুতরার ইমাম বোখারীর বিচারে যেটা বাতিল, ইমাম মুসলিমের বিচারে সেটা সহীহ হাদিস।

> *রসুলের সময়, খোলাফায়ে রাশেদুনের সময় কোনো লিখিত হাদিসগ্রন্থ ছিলো না। রসুলাল্লাহর পর আবু বকর, ওমর, ওসমান পর্যন্ত জাতির নেতৃত্ব ছিল অখণ্ড। একদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে জাতির দৃশ্যটা হচ্ছে এমন- একজন নেতা (খলিফা), নেতার আনুগত্যশীল একটি জাতি এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদ। খলিফা আল্লাহর হুকুম অনুসারে জাতিকে আদেশ-নিষেধ করেছেন।*

এই কথাগুলো বললাম এটা বোঝানোর জন্য যে, সব হাদিসই মানতে হবে এমন গোড়ামিপূর্ণ ধারণা থেকে আগে সরতে হবে। হাদিস আল্লাহর বাণী নয়, আল্লাহ সেগুলো সংরক্ষণও করেন নি। আল্লাহ সংরক্ষণ করেছেন কোর'আন। আর এই কোর'আনই হচ্ছে ইসলামের শরিয়তের মূল মানদণ্ড। সকল ফকীহ ও ইমামগণ এই কথার সঙ্গে একমত যে, কোনো হাদিস যদি কোর'আনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে সেই হাদিসটি বাতিল বলে গণ্য হবে। ফিকাহ শাস্ত্রের সকল গ্রন্থে ফতোয়ার নীতিমালার মধ্যে এই নীতি উল্লেখ করা আছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। আল্লাহ বলেন, তোমরা কাফেরদের আনুগত্য করো না। বরং কোর'আন দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে বড় জেহাদ (জেহাদে আকবার) কর (সুরা ফোরকান ২৩)। এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা গেল, কাফেরদের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার জেহাদ করা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জেহাদ বা জেহাদে আকবর। কিন্তু যখন হাদিসের রেফারেন্স টেনে বলা হয় যে, নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করাই বড় জেহাদ তাহলে কোর'আনের আয়াতকে রদ করতে হয়। এটা করা সম্ভব নয়। তাই হাদিসটিকেই বানোয়াট হাদিস বলে মেনে নিতে হবে।

কোর'আন দীর্ঘ তেইশ বছর সময় নিয়ে রসুলাল্লাহর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আরবের অধিকাংশ এলাকায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে পূর্ণাঙ্গ কোর'আন নাজিল হওয়ার আগেই। যে উম্মতে মোহাম্মদী অর্ধেক দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা করেছেন তারা অধিকাংশই কোর'আনের সংকলিত রূপ চোখেও দেখেন নি। সুতরাং তাদের কাছে না ছিল পূর্ণ কোর'আন আর না ছিল হাদিস। তাদের কাছে ছিল কেবল তওহীদ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এটা নিয়েই আল্লাহর রসুল তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন। রসুলাল্লাহর প্রচেষ্টায় এই কথার উপর একটি জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। সেই জনগোষ্ঠীর জীবনধারা পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা একে একে বিধি-বিধান নাজিল করেছেন। অর্থাৎ এই যুগে ছিল

- **প্রথমত- একজন নেতা (রসুলাল্লাহ),**
- **দ্বিতীয়ত- সেই নেতার উপর নাজিল হওয়া আল্লাহর হুকুম,**
- **তৃতীয়ত- সেই নেতার আনুগত্যকারী একটি জাতি (উম্মতে মোহাম্মদী)।**

রসুলাল্লাহ আল্লাহর হুকুম অনুসারে তাঁর জাতিকে পরিচালিত করেছেন। তিনি নিজে কোনো বিধানদাতা (এলাহ) নন, কারণ বিধাতা একজনই কেবল আল্লাহ। তিনি সেই বিধাতার হুবহু বার্তাবাহক মাত্র। তিনি স্থান-কাল-পাত্র মোতাবেক আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সাহাবীদের বিভিন্ন হুকুম দিয়েছেন, উপদেশ দিয়েছেন। সেগুলোই এক শতাধিক বছর পরে লোকের মুখ থেকে শুনে শুনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ততদিনে ইসলামের প্রকৃত আকিদা বিকৃত হয়ে গেছে। জাতি জেহাদ ত্যাগ করেছে। জাতির নেতৃবৃন্দ ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে আর সব রাজা-বাদশাহদের মতো জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, জাতি শিয়া-সুন্নীসহ বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তারা ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে একে অপরের রক্ত ঝরাচ্ছে। এমনই একটি দ্বন্দ্বমুখর ও সংকটে আচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে হাদিস সংগ্রহ শুরু হয় এবং চলমান থাকে।

রসুলের সময়, খোলাফায়ে রাশেদুনের সময় কোনো লিখিত হাদিসগ্রন্থ ছিলো না। রসুলাল্লাহর পর আবু বকর, ওমর, ওসমান পর্যন্ত জাতির নেতৃত্ব ছিল অখণ্ড। একদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে জাতির দৃশ্যটা হচ্ছে এমন- একজন নেতা (খলিফা), নেতার আনুগত্যশীল একটি জাতি এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদ। খলিফা আল্লাহর হুকুম অনুসারে জাতিকে আদেশ-নিষেধ করেছেন। পরবর্তীতে রসুলাল্লাহর জীবন ইতিহাস ও তাঁর মুখনিসৃত বাণীগুলো হারিয়ে যেন না যায় সে লক্ষ্যে হাদিস ও ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়েছে। জাতির মধ্যে হাজার হাজার পণ্ডিত, জ্ঞানীগুণী মনীষীর জন্ম হয়েছে। তারা এ কাজ গুলো করেছেন। এভাবে কেতাবের পাহাড় গড়ে উঠেছে। কিন্তু অর্ধপৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করতে এসব হাদিসগ্রন্থের প্রয়োজন পড়ে নি। একজন নেতা ও তাঁর আনুগত্যশীল একটি জাতিই যথেষ্ট ছিল। আলী (রা.) এর সময়েই জাতির নেতৃত্ব দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। একজন মানুষকে দুই টুকরো করা হলে সে যেমন মৃত্যুবরণ করে, তেমনি জাতিকেও দুই টুকরো করার পর জাতির মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেল। রসুলাল্লাহর ৬০/৭০ বছর পর জাতির আকিদাই বিকৃত হয়ে গেল। এজন্যই রসুলাল্লাহ বলেছিলেন, "আমার উম্মাহর আয়ু ৬০ থেকে ৭০ বছর (তিরমিজি, মেশকাত)।" আর আকিদা বিকৃত হয়ে গেলে ঈমানের কোনো দাম থাকে না, আর ঈমানভিত্তিক আমলেরও কোনো দাম থাকে না, সেটা যত গুরুত্বপূর্ণ আমলই হোক না কেন। আজকে জাতির মধ্যে প্রকৃত আকিদা নেই, তওহীদ নেই, কোনো নেতা নেই, ঐক্যবদ্ধ জাতিও নেই। এই অবস্থায় তওহীদভিত্তিক দীন প্রতিষ্ঠা না করে আমল করে যাওয়া অর্থহীন।

তাই আপনার প্রশ্নের উত্তর বুঝতে হলে এই তওহীদের মর্ম, এর মাহাত্ম ও গুরুত্ব অবশ্যই জানতে হবে। তওহীদ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। আল্লাহকে জীবনের সর্ব অঙ্গনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক (এলাহ) বলে মেনে নেওয়াই হচ্ছে তওহীদ। এই তওহীদই হচ্ছে জান্নাতের চাবি, এটাই ইসলামের ভিত্তি, সকল আমলের পূর্বশর্ত। যে তওহীদে থাকবে তার জন্য জাহান্নামের আগুনকে আল্লাহ হারাম করে দেবেন। প্রশ্নে হাদিসের উপর আমলের প্রসঙ্গটি এসেছে। হাদিস তো বটেই, কোর'আনে আল্লাহর নির্দেশিত যাবতীয় ফরজ আমলেরও পূর্বশর্ত এই তওহীদ। সুতরাং আল্লাহকে জীবনের সর্ব অঙ্গনে চূড়ান্ত হুকুমদাতা হিসাবে মেনে না নিয়ে কোনো ফরজ আমল করলেও লাভ নেই, তাতে কোনো সওয়াব আমলনামায় যুক্ত হবে না। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ আল্লাহর পরিবর্তে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অর্থাৎ মানুষকে জীবনের সকল অঙ্গনের বিধানদাতা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে।

তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কোর'আন ও হাদিসের কোনটা নিব, কোনটা নিব না। আমাদের প্রথম অঙ্গীকার হবে আমরা আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো হুকুম মানবো না। আল্লাহর নাজিলকৃত মূল গ্রন্থ কোর'আন। এই কোর'আনকে সমর্থন করে, কোর'আনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কোর'আনের পরিপূরক এমন হাদিসগুলোকে আমরা গ্রহণ করব। হাদিস একেবারেই মানবো না, এমন কথা অবান্তর। হাদিসকে সম্পূর্ণরূপে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কারণ হাদিসে নবীর জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে আপনি কোর'আনের উপরই তো আমল করতে পারছেন না। আপনাকে সুদভিত্তিক অর্থনীতি মানতে হচ্ছে, আপনাকে পাশ্চাত্যের তৈরি দণ্ডবিধি মানতে হচ্ছে, রাষ্ট্রব্যবস্থা মানতে হচ্ছে যেগুলো স্বয়ং আল্লাহর হুকুমের বিপরীত। সেখানে হাদিসের হুকুমের উপর আমল করার প্রশ্নই তো ওঠে না। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানাই হচ্ছে ইসলামের প্রাণশক্তি, ইসলামের মূলকথা। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানলেই একমাত্র জান্নাতের গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, অন্য কোনো আমলের জন্য দেওয়া হয় নি।

তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কোর'আন ও হাদিসের কোনটা নিব, কোনটা নিব না। আমাদের প্রথম অঙ্গীকার হবে আমরা আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো হুকুম মানবো না। আল্লাহর নাজিলকৃত মূল গ্রন্থ কোর'আন। এই কোর'আনকে সমর্থন করে, কোর'আনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কোর'আনের পরিপূরক এমন হাদিসগুলোকে আমরা গ্রহণ করব। হাদিস একেবারেই মানবো না, এমন কথা অবান্তর। হাদিসকে সম্পূর্ণরূপে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কারণ হাদিসে নবীর জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোর'আনে কোনো বিষয়ে একটা শব্দও নেই, সেই বিষয়ে আপনি হাদিস নিয়ে এসে আমাকে সেটা মানার জন্য জোর করবেন এটা চলবে না। সেসব বিষয়ে কোনোরূপ মতবিরোধ বা তর্কে আমরা যাব না। কারণ বিষয়টা যদি দীনের কোনো মুখ্য বিষয় হতো, আল্লাহ সেটা কোর'আনে বাদ দিতেন না। যেহেতু কোর'আনে নাই, তাই এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয় রয়েছে। এটা নিয়ে গবেষকদের কৌতূহলের ও গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে কিন্তু দীনের আবশ্যিক বিষয় হিসাবে একে সাধারণ মানুষের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের উপর কেউ চাপিয়ে দিতে পারেন না।

একটি উদাহরণ দিলে হয়ত বিষয়টা আরো পরিষ্কার হবে।

আল্লাহ কোর'আনে বলেছেন, তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না (সুরা ইমরান ১০৩)। আরো অনেক আয়াতে আল্লাহ মো'মেনদের ঐক্যবদ্ধ থেকে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ঐক্য যেন না ভাঙে সেজন্য মতভেদ, গীবত, হিংসা বিদ্বেষ পরিহার, পরস্পরের ত্রুটি সন্ধান, উপহাস, দোষারোপ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকারও নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিষয়গুলো নিয়ে হাদিসের কেতাবগুলোতেও বহু হাদিস আমরা দেখতে পাই। কোর'আনের সাপেক্ষে বর্ণিত সেই হাদিসগুলোকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। এভাবে আল্লাহ কোর'আনে নেতার আদেশ শুনতে, হিজরত ও জেহাদ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এসব বিষয়েও প্রচুর হাদিস রয়েছে। এসব হাদিস আমরা বাদ দিতে পারি না। আমরা এই হাদিসগুলোর উপর আমল করছি।

তওহীদ কীভাবে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

এটা ইতিহাস যে, নবুয়্যত লাভের পর আল্লাহর রসুল সর্বপ্রথম যেই কাজটি আরম্ভ করেছিলেন তা হচ্ছে - তওহীদের উপর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং এই কাজটিই তিনি মক্কার তেরোটি বছর ধরে চালিয়ে গেছেন, অন্য কোনোদিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাও করেননি। সমস্ত আরবে তখন যুদ্ধের মহামারী। তিনি জনগণের তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে যুদ্ধ-রক্তপাতের ক্ষতিকর দিক বোঝাতে পারতেন। বিক্ষোভ, প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দিতে পারতেন। চোর, ডাকাত, মদখোর, সুদখোরদের ওয়াজ নসিহত করে ভালো মানুষ বানানোর চেষ্টা করতে পারতেন। অশ্লীলতায় ছেয়ে যাওয়া সমাজকে পরিশুদ্ধ করতে প্রচার-প্রচারণা, ক্যাম্পেইন চালাতে পারতেন। নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য নারী সহায়তা কেন্দ্র খুলতে পারতেন।

> *আল্লাহর রসুল দেখলেন সমাজে যতরকম অন্যায়, অপকর্ম চলছে তার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে জাতির পরিচালকরা, হর্তাকর্তা ও ধর্মব্যবসায়ী পুরোহিতরা। তারাই এসবের বেনিফিশিয়ারী। তাদের স্বার্থ মোতাবেক তারা হুকুম দিয়ে সমাজ পরিচালনা করে, আর সেই স্বার্থের খেসারত দেয় হাজার হাজার মানুষ নির্যাতিত হয়ে, নিপীড়িত ও শোষিত বঞ্চিত হয়ে। এই অনাচারের যবনিকাপাত টানতে হলে সমাজের সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে- 'আমরা হুকুম মানবো একমাত্র আল্লাহর'।*

এতিম শিশুদের নিরাপদ জীবনযাপন নিশ্চিত করতে এতিমখানা তৈরি করতে পারতেন। যুদ্ধ-সংঘাতে সর্বস্ব হারানো পরিবারগুলোর জন্য আশ্রয়শিবির স্থাপন করতে পারতেন। মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে সৎ জীবনযাপনের উপদেশ দেওয়ার জন্য তাবলিগ দল গঠন করতে পারতেন। অশিক্ষা-কুশিক্ষার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নিতে পারতেন। কিন্তু ইতিহাস বলে তিনি এসবের কিছুই করলেন না, (অর্থাৎ এগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার সঠিক পথ নয় তা নিশ্চিত হয়ে গেল) তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে কেবল একটি কথার দিকে মানুষকে ডাকতে লাগলেন- হে মানুষ! বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই এবং মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসুল। এই ছোট একটি বাক্যই হচ্ছে এই দীনুল হকের ভিত্তি, এই মূলমন্ত্রের উপরই গড়ে উঠবে ইসলামের সভ্যতা।

এই যে আল্লাহর রসুল অন্য কোনোদিকে মনোযোগ না দিয়ে শুধু তওহীদের প্রচারকার্যে ব্রতী হলেন, এর কারণ কী?

প্রথমত, গুরুত্বের অগ্রাধিকার। যেই সমাজে তওহীদ নেই, আল্লাহর হুকুম চলে না, সেই সমাজে সবার আগে তওহীদ প্রতিষ্ঠাই মুখ্য কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর রসুল জানতেন যদি আরবরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তওহীদের স্বীকৃতিপূর্বক ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, তাহলে আল্লাহর দেওয়া সত্যদীন কায়েম হবে, ফলে মানুষকে ওয়াজ-নসিহত করে অন্যায়-অপকর্ম থেকে ফেরানোর প্রয়োজন পড়বে না। আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমস্ত সমাজ নিজ থেকেই পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে। তখন আর একজন একজন করে মানুষকে ধরে ধরে বোঝাতে হবে না মদ খেও না, সুদ খেও না, অশ্লীলকার্য করো না, রক্তপাত করো না ইত্যাদি। মানুষ চাইলেও আর ওই পথে পা বাড়াতে পারবে না, কারণ সেই অন্যায়-অপকর্মের পথটিই রুদ্ধ হয়ে যাবে। তৃতীয়ত, হাজারো দল-উপদল-গোত্র-মতবাদে বিভক্ত মানুষগুলোকে একটি নূন্যতম শর্তের উপরে ঐক্যবদ্ধ করা, যেটার মধ্যে সবাই আসতে পারে। এই নূন্যতম শর্তটিই হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জান্নাতে যাবার জন্য এর চাইতে নূন্যতম কোনো শর্ত আর নেই, কাজেই তওহীদের ভিত্তিতেই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা শুরু করলেন আল্লাহর রসুল।

আল্লাহর রসুল দেখলেন সমাজে যতরকম অন্যায়, অপকর্ম চলছে তার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে জাতির পরিচালকরা, হর্তাকর্তা ও ধর্মব্যবসায়ী পুরোহিতরা। তারাই এসবের বেনিফিশিয়ারী। তাদের স্বার্থ মোতাবেক তারা হুকুম দিয়ে সমাজ পরিচালনা করে, আর সেই স্বার্থের খেসারত দেয় হাজার হাজার মানুষ নির্যাতিত হয়ে, নিপীড়িত ও শোষিত বঞ্চিত হয়ে। এই অনাচারের যবনিকাপাত টানতে হলে সমাজের সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে- 'আমরা হুকুম মানবো একমাত্র আল্লাহর'। অমুক পুরোহিত

কী হুকুম দিলেন, অমুক গোত্রপতি কী হুকুম দিলেন, অমুক রাজা-বাদশা কী হুকুম দিলেন ইত্যাদি আমরা দেখব না, আমরা শুধু দেখব আল্লাহ কী হুকুম দিলেন। আল্লাহ হচ্ছেন যাবতীয় ন্যায় ও সত্যের উৎস, কাজেই সকল প্রকার ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে, সব মানুষের মঙ্গল সাধনার্থে, নির্ভুল হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই আছে। আমরা কোনো মানুষের গোলামী করব না, ধনী-গরীব, সাদা-কালো, রাজা-প্রজা সকলেই আল্লাহর গোলাম, আমরা সবাই গোলামী করব একমাত্র আল্লাহর।

সাম্প্রদায়িক ও গোত্রগত বিভাজন আরব সমাজের পশ্চাদপদতার অন্যতম কারণ ছিল। তওহীদ এই বিভাজন দূর করে সকল ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-বংশের মানুষকে এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। কে কোন ধর্মের, কে কোন বর্ণের, কে কোন গোত্রের- তা বিবেচ্য বিষয় ছিল না, যারাই ন্যায় ও সত্যের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে তারাই হয়ে গেছে একে অপরের ভাই ভাই।

এই সিদ্ধান্ত যদি জনগণ নেয় তাহলেই তাদের মুক্তি, হাজারো রোগ-ব্যাধিতে জর্জরিত মৃত্যুপথযাত্রী এই জাতির এটাই একমাত্র ওষুধ যা তাদের দেহে নতুন প্রাণসঞ্চার করতে পারে। কাজেই আল্লাহর রসুল নবুয়্যত লাভের মুহূর্তটি থেকে মদীনায় হিজরত পর্যন্ত ১৩টি বছর নিবিষ্টচিত্তে কেবল তওহীদের দিকেই মানুষকে ডেকে গেছেন। একটি সময় এল, যখন মদীনার মানুষ তওহীদের স্বীকৃতি দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হলো, আল্লাহর রসুল তাদেরকে নিয়ে গড়ে তুললেন ছোট্ট একটি অখণ্ড জাতি। ওই ঐক্যবদ্ধ জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, বিচারিক, সামরিক ও আন্তর্জাতিক জীবনে যখন যেই বিধানের প্রয়োজন হলো আল্লাহ পবিত্র কোর'আনের মাধ্যমে তা পাঠাতে থাকলেন। ইতিহাস স্বাক্ষী, তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবার অনতিবিলম্বেই জাতি উন্নতি ও প্রগতির কোথায় গিয়ে দাঁড়াল তা আজকের দুনিয়াতে কল্পনাও করা যায় না। পরবর্তী দশ বছর আল্লাহর রসুল অক্লান্ত সংগ্রামের মাধ্যমে বাকি আরব উপদ্বীপকেও ওই শান্তি ও নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে এনে আল্লাহর কাছে চলে গেলেন। তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় আরবে কী পরিবর্তন এসেছিল তার কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি।

অনৈক্য-হানাহানিতে লিপ্ত দাঙ্গাবাজ আরবদেরকে ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করেছিল তওহীদ। বংশানুক্রমিক শত্রুতা আর রক্তপাতে নিমজ্জিত আরব জাতিকে একে অপরের ভাই বানিয়ে দিয়েছিল। আরব-অনারব, আশরাফ-আতরাফ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-নিরক্ষরের আকাশ-পাতাল মর্যাদার ব্যবধান দূর করেছিল। মর্যাদার একমাত্র মানদণ্ড নির্ধারিত হয়েছিল "তাকওয়া" অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় বেছে সাবধানে জীবন যাপন করা। যিনি যত ন্যায়ের পক্ষাবলম্বনকারী তিনি ছিলেন তত মর্যাদাবান। যে সমাজে দাসদেরকে মানুষ মনে করা হত না, তওহীদ প্রতিষ্ঠার পর সেই সমাজের ক্রীতদাস বেলালকে (রা.) ক্বাবার ঊর্ধ্বে উঠিয়ে (মক্কা বিজয়ের পর) আল্লাহর রসুল বুঝিয়ে দিয়েছিলেন- সবার ঊর্ধ্বে মানুষ, সবার উপরে মানবতার স্থান। আল্লাহর কাছে একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষের মূল্য তাঁর ক্বাবার চেয়েও অধিক। কৃতদাস যায়েদ ও তার পুত্র উসামাকে সেনাপ্রধান বানিয়ে রসুল প্রমাণ করলেন- যোগ্যতা ও তাকওয়ায় যে শ্রেষ্ঠ সেই প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। বংশ-আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব নয়। এই সাম্যবাদী আদর্শ লাখ লাখ বেলাল, যায়েদদের অন্তরে মুক্তির তুফান সৃষ্টি করেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সাম্প্রদায়িক ও গোত্রগত বিভাজন আরব সমাজের পশ্চাদপদতার অন্যতম কারণ ছিল। তওহীদ এই বিভাজন দূর করে সকল ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-বংশের মানুষকে এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। কে কোন ধর্মের, কে কোন বর্ণের, কে কোন গোত্রের- তা বিবেচ্য বিষয় ছিল না, যারাই ন্যায় ও সত্যের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে তারাই হয়ে গেছে একে অপরের ভাই ভাই। নির্যাতিত-নিপীড়িত, শোষিত মানুষ, যারা বেঁচে থাকত গোত্রপতি, সমাজপতি ও যাজক-পুরোহিতদের কৃপাগুণে, যাদের কোনো অধিকার ছিল না, সম্মান ছিল না, যাদের মাথাকাটা যাবার জন্য সমাজপতিদের একটি সিদ্ধান্তই যথেষ্ট ছিল, তওহীদ তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিল। ওই দাসশ্রেণির মানুষই এক সময় তাদের 'আমিরুল মু'মিনিনের' গায়ের জামা কীভাবে বানানো হলো তার কৈফিয়ত জানতে চেয়েছে, জনসম্মুখে কৈফিয়ত দিতে হয়েছে অর্ধ-পৃথিবীর শাসককে। শুধু ওই সময়ের পৃথিবীতেই নয়, এমন দৃষ্টান্ত আজকের যুগেও কেউ স্থাপন করতে পারে না। তওহীদ ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিয়েছে, বাস্তুহারাকে বাস্তু দিয়েছে। কে কোথায় কী সমস্যায় পড়ে আছে তার সমাধান করার জন্য রাতের আঁধারে রাস্তাঘাটে, অলি-গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন তওহীদের ঝাণ্ডাবাহী মো'মেনদের খলিফা, অর্ধপৃথিবীর শাসনকর্তা। তওহীদে ঐক্যবদ্ধ হবার ফলে এমন স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, অর্ধপৃথিবীর

শাসনকর্তা একটি খেজুরপাতার ছাউনি দেয়া মসজিদে বসে রাজ্য শাসন করতেন। যার আবার একটির বেশি জামা ছিল না। যে ব্যক্তি তটস্থ থাকতেন তার শাসনের অধীনে কেউ কোথাও কষ্ট পাচ্ছে কিনা, একটি কুকুরও না খেয়ে থাকছে কিনা সেই দুশ্চিন্তায়। ঘুম এলে গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়তেন। যার যখন ইচ্ছা খলিফার সাথে দেখা করত, সমস্যা বলত, সমাধান হয়ে যেত।

> ***আজ একজন ইহুদিকে মুসলিম বানানো বা মুসলিমকে খৃষ্টান বানানো যতটা কষ্টসাধ্য, একজন শিয়াকে সুন্নি বানানো, সুন্নিকে শিয়া বানানো তার চেয়েও বেশি কষ্টসাধ্য। সুতরাং ইসলামের নামে তৈরি হওয়া সমস্ত ফেরকা-মাজহাব-তরিকার মানুষ কোনো একদিন নির্দিষ্ট কোনো ফেরকায় প্রবেশ করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে, সবাই সুন্নি হয়ে যাবে অথবা সবাই শিয়া হয়ে যাবে, সবাই হানাফি হয়ে যাবে বা সবাই হাম্বলি হয়ে যাবে, সবাই এক পীরের মুরিদ হয়ে যাবে বা সবাই এক দলের অনুসারী হয়ে যাবে- এমন আশার পালে কস্মিনকালেও যে হাওয়া লাগবে না তাতে সন্দেহ নেই। যেটা সম্ভব হতে পারে তা হচ্ছে- একটি সাধারণ বক্তব্যের ভিত্তিতে সবাইকে এক প্লাটফর্মে নিয়ে আসা, কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ব্যক্তিগত আচার-প্রথা, ব্যক্তিগত মতবাদের দিকে না তাকিয়ে জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবে সবাইকে একটি কথার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা।***

মূল কথা হচ্ছে তওহীদ মানুষের বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান করতে পেরেছিল। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, তওহীদের ওই ঐক্যবদ্ধনী থেকে বহু শতাব্দী পূর্বেই আমরা বিচ্যুত হয়ে গেছি। পৃথিবীময় মুসলিম বলে পরিচিত আজকের ১৬০ কোটির জনসংখ্যাটি তওহীদের মহাসড়ক থেকে বহু আগেই বিচ্যুত হয়ে মিথ্যার অন্ধকার অলি-গলিতে ঢুকে পড়েছে, শয়তান বহু শতাব্দী আগেই আমাদেরকে সেরাতুল মোস্তাকীম ভুলিয়ে দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে ছিটকে দিয়েছে। কিন্তু সেরাতুল মোস্তাকীম হারিয়ে বিভিন্ন ফেরকা, মাহজাব, তরিকা ইত্যাদির কানাগলিতে ঢুকে পড়েও এই জাতির প্রত্যেকেই ভাবছে একমাত্র তারাই সঠিক পথে আছে, অন্যরা পথভ্রষ্ট। আজ একজন ইহুদিকে মুসলিম বানানো বা মুসলিমকে খৃষ্টান বানানো যতটা কষ্টসাধ্য, একজন শিয়াকে সুন্নি বানানো, সুন্নিকে শিয়া বানানো তার চেয়েও বেশি কষ্টসাধ্য। সুতরাং ইসলামের নামে তৈরি হওয়া সমস্ত ফেরকা-মাজহাব-তরিকার মানুষ কোনো একদিন নির্দিষ্ট কোনো ফেরকায় প্রবেশ করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে, সবাই সুন্নি হয়ে যাবে অথবা সবাই শিয়া হয়ে যাবে, সবাই হানাফি হয়ে যাবে বা সবাই হাম্বলি হয়ে যাবে, সবাই এক পীরের মুরিদ হয়ে যাবে বা সবাই এক দলের অনুসারী হয়ে যাবে- এমন আশার পালে কস্মিনকালেও যে হাওয়া লাগবে না তাতে সন্দেহ নেই। যেটা সম্ভব হতে পারে তা হচ্ছে- একটি সাধারণ বক্তব্যের ভিত্তিতে সবাইকে এক প্লাটফর্মে নিয়ে আসা, কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ব্যক্তিগত আচার-প্রথা, ব্যক্তিগত মতবাদের দিকে না তাকিয়ে জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবে সবাইকে একটি কথার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা। আর তেমন সর্বজনগ্রাহ্য ঐক্যসূত্র একটিই আছে, সেটা এই দ্বীনের মূলমন্ত্র, ভিত্তি- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আমরা আল্লাহর হুকুম ছাড়া অন্য কারো হুকুম মানি না। এই ঐক্যসূত্র দিয়ে আল্লাহর রসুল আরবের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত আইয়্যামে জাহেলিয়াতের মানুষগুলোকে যখন শত্রুতা ভুলিয়ে একে অপরের ভাই বানাতে পেরেছিলেন তখন আমরাও এই আশায় বুক বাঁধতে পারি যে, বর্তমানের অনৈক্য-সংঘাতে জর্জরিত মানুষগুলোও তওহীদের এই বৈপ্লবিক ঘোষণার মধ্য দিয়েই হারিয়ে ফেলা সেরাতুল মোস্তাকীমে ফিরে আসতে সক্ষম হবে ইনশা'আল্লাহ। সেই লক্ষ্যেই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে হেযবুত তওহীদ।

ভিজিট করুন

facebook.com/
emamht

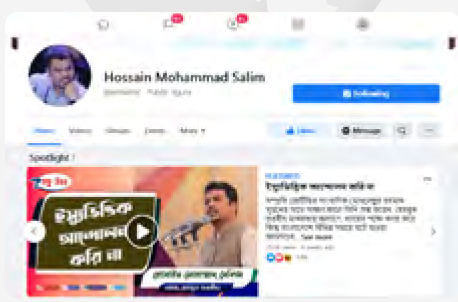

সওমে জীবনধারার পরিবর্তন

অভ্যাস মানুষের দাস

আদিবা ইসলাম

রাহেলা বেগম একজন গৃহিণী। এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে ছিমছাম সংসার। স্বামী সরকারি চাকুরে, ছেলেমেয়েরা স্কুলের চৌহদ্দি পেরিয়ে কলেজ ভার্সিটিতে পড়ছে। সারা বছর একই রুটিনে জীবনযাপন। সকালে উঠে নাশতা বানানো। স্বামী সন্তানদের নাশতা খাইয়ে বাইরে পাঠানো। দুপুরে আবার রান্না। সন্ধ্যায় নাশতা তৈরি। রাতে আবার রান্না। মেয়ে ঘরে থাকলে টুকটাক সহায়তা করে, ঘরকন্নার বাকি ধকল সব রাহেলা বেগমকেই সামলাতে হয়।

বছরের একটি মাসে রাহেলার অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন আসে। সেই মাসটি হচ্ছে রমজান মাস। রাহেলা জানালেন রমজান মাসে তার জীবনধারার পরিবর্তনের কথা।

'আমার বাসার সবাই সওম (রোজা) রাখেন। বাচ্চারা ছোট থাকতে আমাকে দিনের বেলাও রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো, কিন্তু এখন আমাকে রান্নাঘরে যেতে হয় বিকেল বেলায়। পরিবারের জন্য ইফতার তৈরি করি। সন্ধ্যার আগেই উনি অফিস থেকে ফিরে আসেন। আমরা একসাথে বসে ইফতার করি। অন্য সময় একসাথে বসে কেবল রাতের খানাটাই খাওয়া হয়। রাতে আবার ভোররাতের জন্য রান্না করে ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরে উঠে সেগুলো গরম করে খাই। সারাদিন আর রান্নাবান্নার ব্যস্ততা থাকে না। মেয়েদের আসল ব্যস্ততা তো রান্নাঘরেই।' সওমের মাসে যে বাড়তি সময়টুকু পান সেটুকু বই পড়ে আর লেখালেখি করে কাটান রাহেলা বেগম। তিনি ব্যবহারিক জীবনে ধর্মীয় বিধানগুলোর প্রভাব নিয়ে তার নিজস্ব চিন্তাভাবনাগুলো নিয়ে লেখার খাতায় অক্ষর সাজান। বছরে একমাস সওম পালনের কী উপকারিতা তিনি পান জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'মানুষ অভ্যাসের দাস। কিন্তু সাধনা করলে যে কোনো অভ্যাসই মানুষ পাল্টাতে পারে। সিয়াম পালনকে তাই সিয়াম সাধনাও বলা হয়। এই মাসে আল্লাহর একটি হুকুমকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার কারণে আমরা সারাবছরের অভ্যাসকে কত সহজেই পাল্টে ফেলতে পারছি সেটা একবার ভেবে দেখুন। সারাদিন না খেয়ে থাকায় তো আমরা

ছবি: প্রতীকী।

শরীরের কোনো ক্ষতি দেখতে পাচ্ছি না। বরং অন্য সময়ের চেয়ে বেশ হালকা লাগে নিজেকে। জীবনটাও অনেক সহজ হয়ে যায়। বছরের বাকি সময়ও তাহলে আমরা রান্নাঘরে এতটা সময় ও প্রাণশক্তি ব্যয় না করে সৃজনশীল কাজে বা মানবকল্যাণকর কোনো কাজে সময় ব্যয় করতে পারি। সওম রাখার মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বভাবে, অভ্যস্ত জীবনে পরিবর্তন আনার সক্ষমতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করি। শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। সওমের মাস আমাদের শরীর ও মনকে ভিন্ন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে শেখায়। ঘরে খাবার থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধা সইবার যে চর্চা আমরা করি তার সুফল আমরা রমজান গেলেই ভুলে যাই। তা না করে আমরা যদি সারা বছর এই চর্চা চালিয়ে যেতে পারি তাহলে অর্থেরও অনেক সাশ্রয় আমরা করতে পারব।"

কিন্তু রমজান মাসে কি আসলেই আমাদের খাওয়াবাবদ ব্যয়হ্রাস পায়? বাজারের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোর দাম তো আকাশ ছোঁয়। এর কারণ কী মনে করেন রাহেলা বেগম।

'আমাদের সমাজে সওম পালনের যে দৃশ্যটা আমরা ছোট বেলা থেকে দেখে আসছি, এর সাথে কিন্তু ধর্মগ্রন্থের বা ইতিহাসের তেমন মিল নেই। আমরা আসলে একটা সংস্কৃতির অনুসরণ করে যাচ্ছি। ইতিহাস পড়লে দেখবেন রসুলাল্লাহর যুগে বা তাঁর পরবর্তী কয়েকশত বছরে রমজান মাস আসলে পণ্যের

দাম কমে যেত। কারণ মানুষ অন্য সময়ের চেয়ে কম খায়। ব্যবসায়ীরা কম দামেই সব খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করত। এই মাসে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা খুঁজে খুঁজে দরিদ্র লোকদের দান করত। আমরাও তো ফেতরা দিই, কিন্ত সেটা খুবই সামান্য পরিমাণ। আমাদের ধনীরাও ঐ দুই এক'শ টাকা ফেতরা দিয়েই মনে করেন আল্লাহর হুকুম পালন করা হয়ে গেল। আসলে এটা হচ্ছে ন্যূনতম দান। যারা অবস্থাসম্পন্ন তাদের উচিত ছিল তাদের নিজেদের অবস্থা মোতাবেক দান করা। সেই শিক্ষাটাও আমরা এখন ভুলে গেছি, এই সংস্কৃতিও হারিয়ে গেছে। সওম আমাদের জীবনে তেমন কোনো শিক্ষা বা প্রভাব ফেলছে না। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, রমজান মাস চলে যাওয়ার সাথে সাথেই আমরা আবার তুমুল বেগে খাওয়া-দাওয়া, অপচয় আরম্ভ করি। এই সওম আমার কাছে প্রহসনমূলক মনে হয়।'

> ***আমাদের সার্বিক জীবনব্যবস্থা আল্লাহর নয়, শয়তানের। সেখানে কেবল সওম পালনের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে অন্যায় থেকে মুক্ত সমাজ আশা করা যায় না। শয়তানকে বেঁধে রাখার যে রূপক বর্ণনা আমরা হাদিসে পাই, সেটা হচ্ছে সেই সমাজে যেখানে ইসলাম জাতীয় জীবনব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, অর্থাৎ ইসলামের সমাজে। আজকে সেই সমাজ কই?***

প্রশ্ন উঠল, এই মাসে শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়, তবু কেন এত অন্যায়? তিনি বললেন, 'শয়তান সম্পর্কে আমার চিন্তাটা কিন্তু একটু অন্য। প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরেই শয়তানের প্ররোচনা কাজ করে। একইভাবে আল্লাহর রূহও মানুষের মধ্যে রয়েছে। এখন আল্লাহর হুকুম মেনে চলার মাধ্যমে আল্লাহর রুহের শক্তি পুষ্টিলাভ করে, মানুষ পবিত্র জীবনে আনন্দ লাভ করে। আবার আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে থাকা শয়তানী শক্তি উৎসাহিত হয়। সে তখন অন্যায় কাজে আনন্দ পায়। আমাদের সার্বিক জীবনব্যবস্থা আল্লাহর নয়, শয়তানের। সেখানে কেবল সওম পালনের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে অন্যায় থেকে মুক্ত সমাজ আশা করা যায় না। শয়তানকে বেঁধে রাখার যে রূপক বর্ণনা আমরা হাদিসে পাই, সেটা হচ্ছে সেই সমাজে যেখানে ইসলাম জাতীয় জীবনব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, অর্থাৎ ইসলামের সমাজে। আজকে সেই সমাজ কই? আজকে তো আমাদের জীবন চলে পাশ্চাত্যের তৈরি বিধান দিয়ে। এখানে শয়তানেরই শাসন, শয়তানেরই রাজত্ব।'

একজন সাধারণ গৃহিণী রাহেলা বেগম কথা প্রসঙ্গে তার কথাগুলো লেখকের সঙ্গে ভাগাভাগি করলেন। এ থেকে তার চিন্তার গভীরতা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া গেল।

লেখক: সদস্য, হেযবুত তওহীদ

ভিজিট করুন
WWW.HEZBUTTAWHEED.ORG